Rizon

মাসুদ রানা

বিপদসীমা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন

সব পিডিএফই তৈরি করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে,যেন সবাই সহজেই বই পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন,তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল।

হ্যাপি রিডিং...... :)

মাসুদ রানা ৩১৯

বিপদসীমা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7319-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বি

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি পি ও বক্স ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-319
BIPADSHEEMA
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

উনত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *ভুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত খাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-৯৯ *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

মগবাজারের এই ফ্ল্যাটবাড়ি একটা সেফহাউসের মতই নিরাপদ: গায়ে-গতরে ইলেকট্রনিক চোখের ছড়াছড়ি, আশপাশে সতর্ক চর্মচক্ষুও কয়েক জোড়া।

সকাল, ন'টা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই মাসুদ রানা অফিসে যাবার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড নিজের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকার পর ভাবছে, একেই কি নার্সিসিজম বলে?

হাসতে গিয়ে বাধা পেল রানা। ঘিয়ে রঙের টেলিফোন বেজে উঠল, একই সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশনটা। ক্রেডল থেকে রিসিভার তোলার সময় চোখ চলে এলো টিভির স্ক্রীনে। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের গ্রিল দেয়া লোহার গেট বন্ধ, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট, পুরনো একটা অস্টিন। গাড়ির ভেতর কে বা কারা আছে বোঝা যাচ্ছে না। গার্ডহাউসের জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে একজন গার্ড, সম্ভবত অস্টিনের ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। অপর গার্ডটাকে দেখা যাচ্ছে না, তবে গার্ডহাউসের ভেতর থেকে সে-ই ফোন করেছে রানাকে 'সার, এক বিদেশী ভদ্রমহিলা,' বলল সে। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। খুব নাকি জরুরী।'

'নাম বলেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা–কিছুটা বিরক্ত, কিছুটা

বিস্মিত। বিদেশিনী অনেকেই ওর টেলিফোন নম্বর জানে, কিন্তু ফ্ল্যাটের ঠিকানা কাউকে দিয়েছে বলে তো মনে পড়ে না।

'না,' জবাব দিল গার্ড? 'এখুনি জেনে নিচ্ছি, সার। তবে, তার আগে বলে নিই, রাস্তার মোড় থেকে জয়নাল এইমাত্র ফোন করে বলল—ভদ্রমহিলাকে ফলো করা হচ্ছে। একটা পিকআপ ভ্যান, সার। দু'জন আরোহী। রাস্তার আরেক মাথায় থেমেছে। সম্ভবত ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির লোকজন, সার।'

'কি করে বুঝলে?'

'আমি না, সার—জয়নাল বলছিল,' তাড়াতাড়ি বলল গার্ড। 'ওর তো এন.এস.এ অফিসে আসা-যাওয়া আছে, পিকআপ ভ্যানটা চেনা চেনা মনে হয়েছে।' পাঁচ সেকেন্ড বিরতি। 'সার, ভদ্রমহিলা নিজের নাম বলছেন মিসেস নেলী হাসান।'

রানার চোখ-মুখ থেকে বিস্ময় ও বিরক্তির ভাব এক নিমেষে দূর হয়ে গেল, তার বদলে ফুটে উঠল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' গার্ডকে বলল ও। 'কেউ একজন পথ দেখিয়ে সোজা আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে এসো ওঁকে। ওঁর সঙ্গে কি আর কেউ আছেন?'

'না, সার, উনি একা।'

'ঠিক আছে। আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ড্রইংরূমে চলে এলো রানা, অন্যমনস্ক।

এই হাসান পরিবারটিকে কোনদিন ভুলতে পারবে না ও। নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট প্রফেসর মাইনুল হাসান যুগান্তকারী একটা ডাইভার্টার মেশিন আবিষ্কার করেছেন। মেশিনটার সাহায্যে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বহনকারী যে-কোন দেশের হেলিকপ্টার, প্লেন, রকেট বা মিসাইলকে যেভাবে খুশি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগের কথা, পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই ভারত থেকে প্রফেসর মইনুল হাসানকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছিল। বাংলাদেশ থেকে মিসেস নেলী হাসান ও ওঁদের একমাত্র সন্তান নেহালকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল,

উদ্দেশ্য ছিল প্রফেসরকে একটা ডাইভার্টার মেশিন বানিয়ে দিতে বাধ্য করা। সুযোগ পেয়ে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সও রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার নামে প্রফেসর হাসানকে আটকে রাখার কম চেষ্টা করেনি। সে যাই হোক, অনেক কষ্ট করে মিসেস হাসান ও নেহালকে পাকিস্তান থেকে, এবং প্রফেসর হাসানকে ভারত থেকে বহাল তবিয়তে দেশে ফিরিয়ে আনে রানা (দেশপ্রেম)।

এরপর দেখা-সাক্ষাৎ না ঘটলেও, সময় ও সুযোগ পেলে পরিবারটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে ও। মূল ডাইভার্টার মেশিনটা কে বা কারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, শুনেছে প্রফেসর হাসান আবার নতুন করে সেটা তৈরি করছেন। এতদিনে নিশ্চয়ই কাজটা শেষ হয়ে গেছে। আরও শুনেছে, খুলনা থেকে ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় স্বামীর কাছে চলে এসেছেন মিসেস নেলী হাসান।

নক হলো দরজায়। সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কাম ইন, প্লীজ।'

দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকে সেটা বন্ধ করলেন মিসেস হাসান, এগিয়ে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। 'ভয় হচ্ছিল গেট থেকেই না বিদায় নিতে হয়। দেখা করলেন, সেজন্যে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ, মিস্টার রানা।' ভদ্রমহিলার চোখের নিচে কালি জমেছে, মুখটা শুকনো।

হাত ধরে ভদ্রমহিলাকে একটা সোফায় বসাল রানা, অমায়িক হেসে বলল, 'আমার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। দেখা না করে আপনাকে ফেরত পাঠাব–আমি? এ আপনি ভাবতে পারলেন?' মিসেস হাসান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হাত তুলে বাধা দিল। 'আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'হাসানের ডায়েরীতে ছিল,' বললেন মিসেস হাসান, লক্ষ করলেন রানার চোখের দৃষ্টি দেয়ালঘড়ি ছুঁয়ে এলো। 'মিস্টার রানা, আমি খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। জানি আপনার এখন অফিসে যাবার সময়, কিন্তু আমার কথাগুলো...'

'অফিসে আজ দেরি করে যাব আমি,' বলল রানা, পিছিয়ে এসে একটা সোফায় বসতে গিয়েও বসল না। 'বিপদ? কি বিপদ?'

'এ একেবারেই অবিশ্বাস্য, মিস্টার রানা!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস হাসান। 'এত কড়া সিকিউরিটি কোন কাজেই এলো না।'

'মানে? কি ঘটেছে বলুন তো?'

'ওই ডাইভার্টার মেশিনটাই আমাদের পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে চলেছে, মিস্টার রানা,' মিসেস হাসান ধরা গলায় বললেন। 'এবার আমার স্বামীকে নয়, ছেলেটাকে কিডন্যাপ করেছে ওরা।'

'ওহ্, গড!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'নেহালকে কিডন্যাপ করা হয়েছে? কবে? কিভাবে?' অন্য আরেকটা প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেল—এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে অথচ বিসিআই তা জানে না, এ-ও কি সম্ভব?

ধীরে ধীরে রানার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলেন মিসেস্ হাসান। একা শুধু নেহালকে নয়, প্রফেসর হাসানের সহকারী তরুণ নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট বাদল চৌধুরীকেও অপহরণ করা হয়েছে। দুটো ঘটনা একই দিন ঘটেছে, আজ থেকে তিন মাস আগে। স্কুলে যাওয়ার পথে একদল সন্ত্রাসী কিডন্যাপ করে নেহালকে। এন.এস.এ-র দু'জন সদস্য পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে, সন্ত্রাসীরা প্রথমেই ওদেরকে গুলি করে মেরে ফেলে। প্রায় একই সময়ে আরেক দল সন্ত্রাসী অফিসে যাওয়ার পথে বাদল চৌধুরীর দু'জন বডিগার্ডকে গুলি করে, তারপর তাকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায়। কি এক অজ্ঞাত কারণে, অন্তত মিসেস হাসানের কারণটা জানা নেই, এন.এস.এ এবং সরকার ঘটনা দুটো বেমালুম চেপে যায়। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়, নেহাল ও বাদল চৌধুরীর নিরাপত্তার স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার

স্বার্থেও, এই কিডন্যাপিঙের কথা প্রকাশ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, প্রথম দিকে বেশ কিছু দিন সিকিউরিটির অজুহাত দেখিয়ে ওঁদের সঙ্গে কাউকে দেখা করতেও দেয়া হয়নি। বলা যায়, প্রায় গৃহবন্দী অবস্থা। তবে অগ্রগতির রিপোর্ট প্রায় নিয়মিতই জানানো হয় তাঁদের। সবক'টা বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সীমান্তও সীল করে দেয়া হয়েছে। গত তিন মাস ধরে এন.এস.এ আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, নেহাল আর বাদল চৌধুরীকে উদ্ধার করা স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কিন্তু প্রফেসর মইনুল হাসান প্রথম থেকেই অন্যরকম জানেন। অপহরণ করার ঠিক দু'দিন পরেই কিডন্যাপাররা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। কুরিয়ার সার্ভিস তাঁর অফিসে একটা প্যাকেট ডেলিভারি দিয়ে যায়, খোলার পর ভেতর থেকে একটা টু-ওয়ে রেডিও সেট আর একটা চিরকুট পান তিনি। চিরকুটে বলা হয়েছে, প্রফেসর সহযোগিতা করলে নেহাল ও বাদল চৌধুরীর কোন ক্ষতি করা হবে না। ফ্রিকোয়েন্সি সেট করা আছে, রেডিও অন করলেই পরবর্তী নির্দেশ দেয়া হবে। অসহযোগিতার পরিণতি হবে ভয়াবহ—নেহাল ও বাদল চৌধুরীকে টুকরো টুকরো করে কেটে কাক-চিলকে খাওয়ানো হবে।

ব্যাপারটা কাউকে কিছু জানাননি প্রফেসর, এমনকি স্ত্রীকেও নয়। রেডিওটা বাড়িতে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখেন, তারপর রাত গভীর হলে ওটা নিয়ে ছাদে উঠে যান, সেট অন করে যোগাযোগ করেন কিডন্যাপারদের সঙ্গে। কিডন্যাপারদের একটাই দাবি—তাঁর আবিস্কৃত ডাইভার্টার মেশিনের থিওরি ও ফর্মুলা চাই। ওগুলো পেলে বাদল চৌধুরীর সাহায্যে একটা ডাইভার্টার মেশিন নিজেরাই বানিয়ে নেবে তারা। এই মেশিন নাকি তাদের খুব দরকার প্রফেসর হাসান একের পর এক অনেক প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু তার একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেয়নি তারা। অগত্যা বাধ্য হয়ে, একমাত্র

সন্তান ও প্রিয় সহকারীর প্রাণ রক্ষার স্বার্থে, রেডিওর মাধ্যমে কিডন্যাপারদের জানিয়ে দিচ্ছেন ডাইভার্টার মেশিন বানাবার কারিগরি কলা-কৌশল। অন্তত স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ার পর এ-কথাই বলেছেন তিনি।

প্রথমে স্বামীর কথা অবিশ্বাস করেননি মিসেস হাসান। সন্দেহ হলো রেডিওতে কিডন্যাপারদের সঙ্গে প্রফেসরের আলাপ শুনে। অপরপ্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ধমক ও হুমকির সুরে অভিযোগ করা হলো–প্রফেসর উল্টোপাল্টা তথ্য দিয়ে ডাইভার্টার মেশিন বানাবার কাজে দেরি করিয়ে দিচ্ছেন। এদিক থেকে প্রতিবাদ করে প্রফেসর বললেন–অভিযোগ সত্যি নয়, তাঁর দেয়া প্রতিটি তথ্য সঠিক।

রেডিও বন্ধ হবার পর স্বামীকে চেপে ধরলেন নেলী। স্ত্রীর জেরার মুখে এক সময় রেগে উঠলেন প্রফেসর, আসল কথাটাও বলে ফেললেন। হ্যাঁ, কিডন্যাপারদের ভুল তথ্য দিচ্ছেন তিনি, তারা যাতে কিছুতেই ডাইভার্টার মেশিন বানাতে না পারে। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে জানালেন সঠিক তথ্য দিয়ে মেশিনটা বানাতে সাহায্য করলে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, সেটি তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তাছাড়া, মেশিন বানাতে সাহায্য করলেও কিডন্যাপাররা নেহাল ও বাদল চৌধুরীকে মুক্তি দেবে, এমন ভাবার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

ছেলেকে নিজের হাতে খুন করতে চলেছেন তাঁর স্বামী, তিনি এখন পাগল হতে চলেছেন পুত্রের নিরাপত্তার চিন্তায়। এন.এস.এ-র তরফ থেকে নিষেধ করে দেয়ায় পুলিস, ডিবি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা বিসিআই-এর কাছে অফিশিয়ালি সাহায্য চাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নেন, ব্যক্তিগতভাবে রানার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন। সেজন্যেই এই অসময়ে আসা।

সব কথা শোনার পর ভিতরে ভিতরে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়ল রানা, কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না। সন্দেহ

নেই, এন.এস.এ তাদের দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও দু'দুটো কিডন্যাপ ঠেকাতে পারেনি তারা। ঘটনা ঘটে যাবার পর অপরাধীদের ধরতেও পারেনি। কিন্তু, যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে–বিসিআই কেন কেসটা টেকওভার করেনি?

রানা সিদ্ধান্ত নিল, বিষয়টা নিয়ে আজই বসের সঙ্গে কথা বলবে ও। তবে তার আগে আরও কিছু তথ্য দরকার। 'প্রফেসর হাসান কি জানতে পেরেছেন,' মিসেস নেলীকে জিজ্ঞেস করল ও, 'কিডন্যাপাররা কোত্থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে বা নেহাল আর বাদল চৌধুরীকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে?'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন। 'তারা ওঁর কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। তবে রেডিওটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল হওয়া সত্ত্বেও কিডন্যাপারদের গলা স্পষ্ট শোনা যায় না, শব্দগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে।'

'হয়তো দেশের বাইরে কোথাও থেকে,' মন্তব্য করল রানা।

'হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়,' বললেন মিসেস হাসান। 'সেজন্যেই ভয় পাচ্ছি, নেহালকে বোধহয় কোনদিন আর ফিরে পাব না–,' এতক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কেঁদে ফেললেন তিনি।

সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর একজন মাকে সান্ত্বনা দেয়া সহজ কাজ নয়। তার ওপর, অভয় ও আশ্বাস দেয়ার আগে রানাকে অনেক কথা ভাবতে হচ্ছে। প্রফেসর হাসানের 'ইউরেকা প্রজেক্ট' এবং প্রজেক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তার দায়িত্ব এন.এস.এ-কে দেয়া হয়েছিল, কাজেই বসের সঙ্গে আলাপ না করে বলা মুশকিল এ-ব্যাপারে বিসিআই কতটুকু কি করতে পারবে। ও বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যান, মিসেস হাসান। বসের সঙ্গে আলাপ করে আজই আপনাকে জানাব কি সিদ্ধান্ত হলো। যে সিদ্ধান্তই হোক, জেনে রাখুন, নেহাল ও বাদল

চৌধুরীকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনা হবে।'

'ভদ্রমহিলা গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য দিতে পেরেছেন? উনি বা প্রফেসর কি জানেন, কারা ওদেরকে কিডন্যাপ করেছে?'

অনুমতি পেয়ে হাতলবিহীন চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিল রানা, বসের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল, বসতে ভুলে গেছে। ওর ইচ্ছা ছিল অফিসে পৌঁছেই বসের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ঘটনা উল্টোভাবে ঘটতে শুরু করল। ওকে দেখেই সহকর্মী বন্ধুরা সবাই একেবারে হৈ-হৈ করে উঠল। কি ব্যাপার? না, বস্ ওর জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, বলেছেন এলেই যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। কালবিলম্ব না করে চেম্বারে ঢুকেছে ও। তারপরই চমকে দেয়া এই প্রশ্ন। নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বসল রানা। 'আপনি তাহলে জানেন,' মৃদুকণ্ঠে বলল। 'কিন্তু বাড়ির একজন গার্ড, জয়নাল বলছিল পিকআপ ভ্যানটা আমাদের নয়, এন.এস.এ-র।' দম নিয়ে গলা সামান্য চড়াল, 'জ্বী-না, কিডন্যাপারদের পরিচয় বা জিম্মিদেরকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে তা ওঁরা জানেন না।'

'পিকআপ ভ্যানটা ওদেরই,' রাহাত খান বললেন। 'ওটাকে অনুসরণ করছিল আরেকটা গাড়ি, সেটা আমাদের।' চেয়ার ছাড়লেন, ওয়ালম্যাপের দিকে এগোচ্ছেন। 'এদিকে এসো।' হাতে একটা পয়েন্টার রয়েছে, সেটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। রানা পাশে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর চাপ দিলেন যন্ত্রের বোতামে।

ওদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো দেয়াল জোড়া মানচিত্র—মায়ানমার। বার্মা বা মায়ানমারের আকৃতিটা এমনই, নিচের অংশটাকে লেজের মত দেখায়। প্রায় ছ'শো কিলোমিটার লম্বা এই লেজের একদিকে আন্দামান সাগর, আরেক দিকে থাইল্যান্ড। রাহাত খান আরেকবার বোতামে চাপ দিতে গোটা

মায়ানমারের পরিবর্তে দেয়াল জুড়ে এবার শুধু ওই লেজটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা। বসের পয়েন্টার একটা জায়গা ছুঁলো। 'এই হলো তাভয়, তাভয়ের নিচে এটা হলো মার্গুই।' পয়েন্টার আরেকটা জায়গা ছুঁলো। 'গোটা লেজটাই গভীর জঙ্গল,' বললেন তিনি। 'জঙ্গলের ভেতর আদিবাসীদেরকে দিয়ে আফিমের চাষ করানো হয়। মাঝে-মধ্যেই মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান চালায়, দু'চারশো অর্ধনগ্ন লোককে ধরে এনে জেলে ভরে। কাজের কাজ কিছু হয় না। সে যাই হোক, আমি তোমাকে চোখ রাখতে বলছি তাভয় ও মার্গুই-এর মাঝখানের জায়গাটায়। লম্বায় প্রায় দুশো কিলোমিটার, চওড়ায় ষাট-পঁয়ষট্টি। সামরিক সরকার এই এলাকার নাম দিয়েছে–মায়ানমারের অভিশাপ। আরাকানী দস্যু মগদের কথা শুনেছ তো? ওই জায়গায় মগ দস্যুদের চেয়েও নিষ্ঠুর ও হিংস্র বক নামে এক আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে। বকেদের নিজস্ব একটা প্রাচীন ধর্ম আছে–বাঘ, সাপ আর কুমির হলো তাদের দেবতা জীবহত্যা, বিশেষ করে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে বলি দেয়াটাকে, সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ বলে মনে করে তারা। সেনাবাহিনী বহু চেষ্টা করেও ওই এলাকায় আজ পর্যন্ত ঢুকতে পারেনি। অথচ নেহাল ও বাদল চৌধুরীর কিডন্যাপাররা ওখান থেকেই প্রফেসর হাসানের সঙ্গে কথা বলছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল রানা, 'আমরা কিভাবে তা জানলাম, সার?'

'বিসিআই-এর রেডিও কমিউনিকেশন এক্সপার্টদের কৃতিত্ব। কিডন্যাপারদের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেস করার পর হিসেব কষে বের করে ফেলেছে দ্বিতীয় রেডিও সেটটা কোথায় রয়েছে। এসো।' ফিরে এসে নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসলেন রাহাত খান।

'ওরা কারা, সার?' নিজের চেয়ারে রানাও বসল।

'ওরা কারা, কি ওদের উদ্দেশ্য, ওদের সঙ্গে আমরা পারব কি না–এ-সব জানার চেষ্টা করতে গিয়েই তো এতটা সময় নষ্ট হলো।' রাহাত খানকে গম্ভীর ও অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। 'এন.এস.এ দু'বারে দু'জন এজেন্টকে পাঠিয়েছিল, এলাকায় পৌঁছাবার আগেই খুন হয়ে গেছে তারা। কেসটা কেড়ে নিতে হয়নি, আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ওরা।'

'আমরা তাহলে কিছুই জানতে পারিনি?' রানার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

'আড়ি পেতে শুনে শুধু এটুকু বোঝা গেছে যে কিডন্যাপাররা জঙ্গলের ভেতর প্রাচীন এক মন্দিরে আস্তানা গেড়েছে।'

'মায়ানমার সরকারকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হয়েছে। সম্ভবত মর্যাদায় আঘাত লাগছে বলেই মায়ানমার সরকার নিজেদের জঙ্গলে বিদেশী কোন শক্তির বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের আস্তানা আছে বলে স্বীকার করতে চাইছে না। আরেকটা কারণ আগেই বলেছি, ওই এলাকার ওপর মায়ানমার সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ওরা নিজেরাই কোন খবর পায় না, আমাদেরকে কিভাবে জানাবে।'

'এখন তাহলে উপায়, সার?' অসহায় বোধ করছে রানা। 'মিসেস নেলী হাসানকে আমি কথা দিয়েছি, যেমন করেই হোক নেহাল আর বাদল চৌধুরীকে আমরা মুক্ত করব...'

'এরকম একটা বিপদে পড়ে কেউ যদি সাহায্য চায় তাকে তো সান্ত্বনা দিতেই হবে,' বললেন রাহাত খান। 'তবে, এক্ষেত্রে তুমি মিসেস হাসানকে কথা না দিলেও, তোমাকে আমরা ওখানে পাঠাতাম–এমন কি নেহাল আর বাদল চৌধুরীকে ওরা জিম্মি না করলেও।'

'ঠিক বুঝলাম না, সার।'

হঠাৎ রেগে গেলেন রাহাত খান। 'কেন, চোখ-কান বুজে আছ

নাকি? দুনিয়ার কোন খবরই রাখো না? আন্তর্জাতিক একটা খবরই তো পরিবেশ গরম করে রেখেছে।'

হঠাৎ যেন রানার চোখ খুলে গেল। 'দুঃখিত, সার। জ্বী, এবার মেলাতে পারছি।' কি ঘটতে যাচ্ছে উপলব্ধি করতে পেরে আতংকিত অনুভব করল, শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে গলার ভেতরটা। আন্তর্জাতিক গরম খবর বলতে একটাই–লাল চীন পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবার ঘোষণা দিয়েছে। চীনের এই বিস্ফোরণ নানাদিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবিদার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একশো মেগাটনের নিউক্লিয়ার বোমাটা বহন করে নিয়ে যাবে একটা দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল, প্রায় বৃত্তাকার একটা পথ ধরে পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দেয়ার পর জনমানবহীন পাহাড়ী এলাকায় আঘাত করবে, কিন্তু তারপরও ধ্বংস হবে না–ধ্বংস হবে সারফেস থেকে দুশো গজ মাটি ও পাথর ভেদ করার পর, এবং তার ঠিক আগে অ্যাকটিভেট করায় নিউক্লিয়ার বোমাটাও বিস্ফোরিত হবে প্রায় ওই একই সময়ে।

চীনের এই ঘোষণা শুনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সাংঘাতিক খেপে গেছে। পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ চুক্তির কথা তুলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন, চীন এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে সেটাকে সভ্যতা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এ-ব্যাপারে ফ্রান্স মৌন থাকার কৌশল অবলম্বন করলেও, ব্রিটেন সহ পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সবগুলো দেশ চীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ওদিকে চীন বলছে, সিটিবিটিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত ও পাকিস্তান যেখানে সারফেসের প্রায় কাছাকাছি বারবার পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে, সেখানে সারফেস থেকে দুশো গজ গভীরে তারা যদি নিজেদের বোমাটা ফাটায় তাহলে কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। এরপর জানিয়েছে, গোটা

ব্যাপারটাকে তারা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে–চলতি মাসের তেরো তারিখে বোমা নিয়ে আকাশে উঠবে তাদের মিসাইল, নির্দিষ্ট স্থানে বিস্ফোরণও ঘটবে, পারলে কেউ ঠেকাক।

তর্কে ও যুক্তিতে হেরে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন জাতিসংঘকে বলছে, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডেকে চীনের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাব তোলা হোক। তবে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, চীন অবশ্যই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দিবে। 'সার!' রানা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। 'তাহলে চীনের আকাশ থেকে দূরপাল্লার ওই মিসাইল হাইজ্যাক করার প্ল্যান করেছে ওরা! ডাইভার্টার মেশিনটা সেজন্যেই দরকার।'

'হ্যাঁ।' রাহাত খান যেন পাথরের একটা মূর্তি।

'চীন সরকারকে দিয়ে টেস্ট বাতিল করানো যায় না?' পরমুহূর্তে নিজেই মাথা নাড়ল রানা। 'না, এই পরিস্থিতিতে টেস্ট বাতিল করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'অনুরোধ করতে গেলে ওরা ধরে নেবে, আমাদের মাধ্যমে এটা আসলে আমেরিকার চাল,' বললেন রাহাত খান। 'তাছাড়া, আমাদের হাতে নিরেট কোন প্রমাণও তো নেই।'

মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে রানা, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর 'এত বড় একটা কাজে কারা হাত দেবে, সার?'

'তাদের পরিচয় আর ক্ষমতা যাই হোক,' রাহাত খান থমথমে গলায় বললেন, 'তোমার কাজ হবে ষড়যন্ত্রটা ব্যর্থ করে দিয়ে নেহাল আর বাদল চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনা।'

জীবনে বোধহয় এই প্রথম কোন অ্যাসাইনমেন্টকে বড় বে ভারী বলে মনে হচ্ছে রানার। 'আমার একজন গাইড দরকার হবে,' বলল ও। 'ইয়ানগনে বৃষ্টি, রবিন আর মুকুল আছে–আপনি আপত্তি না করলে ওদের একজনকে সঙ্গে নিতে চাই

'ও, তোমাকে বলা হয়নি।' ক্ষীণ একটু হাসলেন রাহাত খান। 'কাজটা তোমার, কিন্তু তুমি ছুটিতে থাকায় আমাকে করতে

হয়েছে।'

'কি কাজ, সার?' রানা অবাক।

'বৃষ্টি ট্র্যান্সফার হতে চাইছিল, তাই তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি,' রাহাত খান বললেন। 'রানা এজেন্সির ইয়ানগন শাখার প্রধান এখন নতুন একটা মেয়ে, শিউলি সামাদ। ট্রেনিং কোর্সে খুব ভাল করেছে ও, তাই সরাসরি শাখা প্রধান হিসেবে পাঠিয়েছি। কি জানি, আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে। সুযোগ পেলে একটু পরখ করে নিয়ো। যাই হোক, তাকে আমি বলে রাখছি, সে তোমার জন্যে গাইড যোগাড় করে রাখবে। বাকি যা জানার সোহেলের কাছ থেকে জেনে নাও আমি চাই কালই তুমি ইয়ানগনে পৌঁছাও।'

'আজ সাত তারিখ,' খুব নিচু গলায় বলল রানা। 'তেরো তারিখে...'

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'মায়ানমার সময় সকাল ঠিক সাতটায়।' একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন। 'ও, আরেকটা কথা।' মুখ তুলে তাকালেন। 'ওরা যদি ডাইভার্টার মেশিনটা বানিয়ে ফেলে, যে-কোন মূল্যে সেটাকে ধ্বংস করে দিয়ে আসবে তুমি।'

'ইয়েস, সার।'

'যাও।'

দরজার কাছে পৌঁছেছে রানা, ডাকটা পিলে চমকে দিল।

'শোনো।'

ফিরে এলো রানা ডেস্কের কাছে।

'ব্যাপারটা হয়তো প্রাসঙ্গিক নয়,' বললেন রাহাত খান। 'হয়তো এই ব্যাপারটার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। তবু তথ্যটা তোমার জানা থাকা দরকার।'

'কি তথ্য, সার?'

'ভারতীয় একটা রণতরী–রণতরী মানে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, শুভেচ্ছা সফরে থাইল্যান্ডে যাচ্ছে। আগামী

দু'একদিনের মধ্যে ব্যাংকক বন্দরে পৌঁছবে ওটা। ঠিক আছে, এবার তুমি যেতে পারো।'

দুই

মায়ানমারের রাজধানী – ইয়ানগন।

উথান্ট স্কয়ারের কাছে হোটেল ইন্টারকনে উঠেছে রানা। পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজ-পত্রে ওর নাম মাসুদ রানাই বহাল আছে, ভিসায় লেখা আছে ট্যুরিস্ট; সময় ও সুযোগ হলে সৌখিন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে বিখ্যাত দু'একটা সাইট দেখার ইচ্ছে আছে।

নিজের স্যুইটে বসেই লাঞ্চ খেলো রানা। রুম সার্ভিস টেবিল পরিষ্কার করে ফিরে যাচ্ছে, তাকে ডেকে রেন্ট-আ-কার থেকে একটা টয়োটা স্টারলেট আনিয়ে রাখতে বলল–দশ মিনিট পর বেরুবে ও।

ঐতিহ্য নামে অ্যান্টিকস্ ও হ্যান্ডিক্রাফটস্-এর একটা দোকান আছে জেনারেল খই খই কুয়া রোডে। ওটাই রানা এজেন্সির ইয়ানগন শাখা। সামরিক সরকার কাজ করার লাইসেন্স দেয়নি, তাই বাধ্য হয়ে কৌশল ও ক্যামোফ্লেজের আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিছুদিন আগে আগুন লেগে ছাই হয়ে গিয়েছিল ঐতিহ্য, আবার নতুন করে দাঁড় করানো হয়েছে দোকানটাকে।

শাখা প্রধান নতুন মেয়ে, সোহেলের পরামর্শ মনে রেখে শিউলি সামাদকে প্রথমে ফোন করারই সিদ্ধান্ত নিল রানা। দেখা যাক, ঢাকা থেকে মাত্র কালকে পাওয়া কোড বা পাসওয়ার্ড এরই

মধ্যে ঠিকঠাক মুখস্থ করেছে কিঁ না।

রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা। অপরপ্রান্তে একবার মাত্র রিঙ হলো, কেউ যেন বেল বাজার অপেক্ষায় ফোনের সামনে বসে ছিল। 'হ্যালো?' সুরেলা নারীকণ্ঠ। তবে কি কারণে কে জানে উত্তেজনায় টান টান।

রানা ভাবল, নার্ভাস? 'খেজুর গাছ কেটে রস বের করা হয়, কেমন?' জিজ্ঞেস করল ও, যেন কৌতুক করছে।

'সেই রস দিয়ে গুড়ও তৈরি করে ওরা,' অপরপ্রান্ত থেকে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল অচেনা নারীকণ্ঠ। 'তবে ওরা সিউলি, একটা বিশেষ সম্প্রদায়। আমি শিউলি–শেফালি বা শেফালিকা–ফুল।'

মনে মনে মেয়েটার প্রশংসা করল রানা, পাসওয়ার্ডের প্রতিটি বর্ণ মুখস্থ করে রেখেছে। তবে নতুন বলেই বোধহয় একটু নার্ভাস। নার্ভাস? নাকি এজেন্সির সুদর্শন ডিরেক্টরকে নিয়ে দিবাস্বপ্নে বিভোর? সস্নেহে নিজেকে একটু তিরস্কার করল রানা, আপনমনে হাসছে। তবে ওর এজেন্সির ইয়ানগন শাখা ঐতিহ্যের অফিস কামরায় এই মুহূর্তে কি ঘটছে তা যদি দেখতে পেত, এই হাসি ওকে আর হাসতে হত না।

'মাসুদ ভাই,' আবার বলল শিউলি, শিরদাঁড়ার ওপর পিস্তলের মাজল চেপে বসায় গলার আওয়াজের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। 'তাড়াতাড়ি চলে আসুন, আমরা সবাই আপনার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি।'

হাসিটা এখনও রানার মুখে একটু লেগে আছে। 'ঠিক বুঝলাম না, তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছ মানে?'

অপরপ্রান্তে কোন শব্দ করছে না শিউলি। ওর পাশে সমবয়েসী ও অপরূপ সুন্দরী পাকিস্তানী যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, অন্য আরেক সেট রিসিভারে সে-ও রানার কথা শুনছে, শোনার পর শিউলির কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে নিচু গলায় শিখিয়ে দিচ্ছে উত্তরে কি বলতে হবে। চমৎকার বাংলা জানে সে।

গতকাল ঢাকা থেকে শিউলির কাছে পাঠানো পাসওয়ার্ড এবং রাহাত খানের সমস্ত নির্দেশ আড়ি পাতা যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করেছে ওই মেয়ে–আইএসআই এজেন্ট শাহিদা নাসরিন। শিউলির শিরদাঁড়ায় পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন বার্মীজ গ্যাঙ লীডার, নাসরিন তার চোখে চোখ রেখে একবার একটু মাথা ঝাঁকালেই ট্রিগার টেনে দেবে সে। এটা যে স্রেফ হুমকি নয়, শিউলি তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। সেজন্যেই পাসওয়ার্ড উচ্চারণ করার সময় দু'একটা শব্দ এদিক ওদিক করে রানাকে সাবধান করে দেয়ার চিন্তাটা বাতিল করে দেয় সে। এবার রানার প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হচ্ছে, কারণ উত্তরটা তৈরি করতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে নাসরিন। দশ সেকেন্ড পার হলো। এতক্ষণে শিউলির কানে ফিসফিস করল সে, 'বলো,...'

শিখিয়ে দেয়া উত্তরটা এক দমে আওড়ে গেল শিউলি, 'বস্ আপনার জন্যে একজন গাইডের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন, জানেন নিশ্চয়ই, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'তো আমরা আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিকে ব্যাপারটা জানাই,' বলল শিউলি। 'সেখান থেকে কিভাবে যেন খবরটা রটে গেছে–সকালে অফিসে এসে দেখি পাঁচজন গাইড ইন্টারভিউ দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেজন্যেই বলছিলাম, তাড়াতাড়ি এসে ভিড় কমাতে সাহায্য করুন।' সকালে অফিসে এসে পাঁচজন বার্মীজ গুণ্ডা আর নাসরিনকে দেখেছে শিউলি, ছ'জন মিলে রবিন আর মুকুলকে যান্ত্রিক পুতুল বানিয়ে রেখেছিল। ছ'টা পিস্তলের মুখে সে নিজেও এখন ওদের মত একটা দম দেয়া পুতুলে পরিণত হয়েছে। ওদের সব ক'টা অস্ত্র, দুই সেট চাবির গোছা কেড়ে নেয়া হয়েছে। অ্যালার্ম সিস্টেমও অকেজো করা হয়েছে। তবে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে কথা বলার সময় কখনও দম আটকে রাখছে

শিউলি, কখনও হাঁপাচ্ছে—এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ ভাই যাতে কিছু একটা সন্দেহ করেন, বোকার মত যাতে নাসরিনের ফাঁদে পা না দেন। কারণ নাসরিন তাকে বলেছে, তাদের এই গোটা আয়োজন শুধু মাসুদ রানাকে খুন করার জন্যেই।

'ও, আচ্ছা।' শব্দ করে হাসল রানা। 'ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি আমি। রবিন আর মুকুলকে থাকতে বলো, কেমন?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

রুম সার্ভিস ইন্টারকমে জানাল, হোটেলের পার্কিং এরিয়ায় ক্রীম কালারের টয়োটা স্টারলেট অপেক্ষা করছে। আগে থেকেই সুটেডবুটেড হয়ে আছে রানা, তবে সশস্ত্র হতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। ব্রিফকেসের ফলস বটমে ভরে প্রিয় ওয়ালথার পিস্তল ও ছুরিটা আনতে হয়েছে, সেগুলো বের করে জায়গা মত রাখল। হোলস্টার আনেনি, পিস্তলটা গুঁজে রাখল নাভির পাশে বেল্টে। খাপ সহ ছুরিটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকাল বাম বগলের কাছাকাছি বাহুতে।

ঠিক দুটোর সময় গাড়ি নিয়ে রওনা হলো রানা। জেনারেল খই খই কুয়া অভিজাত এলাকা, বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁ আর শপিং মল-এর ছড়াছড়ি। যানবাহনের অবিচ্ছিন্ন মিছিলে অংশ নিয়ে হ্যান্ডিক্রাফটস্-এর দোকান ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে এলো ও, অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। তবে নিশ্চিত হবার জন্যে আরও সময় নিয়ে তাকিয়ে থাকা দরকার।

বড় একটা দালানের পুরো গ্রাউন্ডফ্লোর ভাড়া নিয়েছে ঐতিহ্য। দালানটার পিছন দিকে এসে নির্জন ফাঁকা রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামাল রানা। দ্রুত হেঁটে আবার খই খই কুয়া রোডে ফিরে এলো, রাস্তার ওপার থেকে ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। খানিক পর একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে জানালার সামনে বসল, এখান

থেকেও দোকানটা দেখতে পাচ্ছে। রবিন ও মুকুলকে চিনতে পারল ও, পাঁচ-সাতজন বর্মী খদ্দেরকে অ্যান্টিকস্ বা হ্যান্ডিক্রাফটস্ দেখাচ্ছে। দু'জনকেই সুস্থ, শান্ত ও স্বাভাবিক লাগছে। দোকানের সামনের অংশে কোন মেয়ে নেই। শিউলির অবশ্য অফিস কামরাতেই থাকার কথা, ভাবল রানা। তবে মনে একটা প্রশ্ন জাগল–গাইড পাঁচজন কোথায়?

ক'জন খদ্দের গুনল রানা। ছ'জন। এদের মধ্যে পাঁচজন যদি গাইড হয়, তাদেরকেও দোকানের জিনিস-পত্র দেখাতে এত ব্যস্ত হবে কেন রবিন আর মুকুল?

ওয়েটার কফি দিয়ে গেল। রাস্তার ওপারে চোখ, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে রানা। পাঁচ মিনিট পার হলো। ছ'জন থেকে কমে ঐতিহ্যে খদ্দের এখন দু'জন, বাকি চারজন কেনাকাটা শেষ করে চলে গেছে। পরবর্তী তিন মিনিটে দোকানটা খদ্দের শূন্য হয়ে গেল। রানা চিন্তিত। গাইডরা তাহলে কোথায়? শিউলি নিশ্চয়ই তাদেরকে অফিস কামরায় বসায়নি!

এই সময় ভেতর দিক থেকে দোকানে একটা মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। কত দূর থেকে দেখছে, তারপরও যেন মাথাটা ঘুরে উঠতে চাইল, এতই সুন্দর সে। গ্রীক দেবীর সঙ্গে খুব মেলে দৈহিক গড়ন আর মুখের আদল। লাল, বেগুনি ও সবুজ রঙের বুটিদার কামিজের সঙ্গে কলাপাতা রঙের সিল্ক সালোয়ার আর ওড়না দারুণ মানিয়েছে। সোহেল তাহলে বাড়িয়ে বলেনি, শিউলি সামাদ লাখে একটা মেয়েই বটে, ভাবল রানা। এই যে ভুলটা করছে ও, সেজন্যে ওকে দোষ দেয়া চলে না। ওর তো আর জানার কথা নয় যে শিউলিকে নয়, ও নাসরিনকে দেখে হাঁ হয়ে গেছে। আসলে শাহিদা নাসরিনও লাখে একটা সুন্দরী।

রানা লক্ষ করল, রবিন বা মুকুলের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না শিউলি। সে তাকিয়ে আছে দোকানের কাঁচ লাগানো উইন্ডো বা জানালার দিকে। ঠিক সরাসরি জানালার দিকেও নয়, তার দৃষ্টি

জানালার নিচে স্থির হয়ে আছে। দৃষ্টি স্থির হলেও, ঠোঁট জোড়া নড়ছে। রানা ভাবল, কি ব্যাপার, কার সঙ্গে কথা বলছে শিউলি?

নিজেকে দোকান ঘরটার ভেতর নিয়ে এলো রানা–শোকেস, র‍্যাক, চেয়ার, সোফা যেখানে যা আছে সব খুঁটিয়ে দেখল–সবই স্মৃতির সাহায্যে কল্পনায়। তবে তাতেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। জানালার নিচে রয়েছে নিচু ও লম্বা এক প্রস্থ সোফা, রাস্তার দিকে পিছন ফিরে তাতে যদি একটু বেঁটে পাঁচজন লোক বসে থাকে, বাইরে থেকে তাদেরকে দেখতে পাবার কথা নয়।

বিল মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো রানা, রেস্তোরাঁর পাশের সিঁড়ি বেয়ে ওই একই দালানের চারতলার ছাদে উঠে এসে পকেট থেকে বিনকিউলারটা বের করল। তথাকথিত পাঁচজন গাইডের হিসাব পেতে হবে ওকে।

কিন্তু হিসাব মিলল না। ঐতিহ্যের ভেতর এখন সবখানে রানার দৃষ্টি পড়ছে। কাঁচ লাগানো জানালার নিচে ঠিকই আছে লম্বা একটা সোফা, তাতে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে একটু খাটো তিনজন বার্মীজ বসে আছে। মাত্র তিনজন। তাদের সঙ্গে কথা বলে রানার শিউলি এখন আবার ভেতর দিকে ফিরে যাচ্ছে। তবে রানার মনে একটা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে সে। রবিন বা মুকুলের সঙ্গে কোন কথাই বলল না মেয়েটা–কেন? শুধু যে কথা বলেনি তা নয়, ওদের দু'জনের দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। এ হয়তো কিছুই নয়, তবে মনটা খুঁত-খুঁত করছে।

আবার রাস্তায় নেমে এলো রানা। অনেক হয়েছে, এবার ওকে ঐতিহ্যে যেতে হয়। তবে সামনে দিয়ে নয়, পিছন দিক দিয়ে ঢুকবে। ওর মন বলছে, তা না হলে পাঁচজন গাইডের হিসাব মেলানো যাবে না।

ফাঁকা, নির্জন রাস্তার যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই টয়োটাকে পেল রানা, উপরি লাভ হলো এই যে পাঁচ গাইডের হিসাব

আরেকটু মিলল—গাড়ির তলায় শুয়ে এঞ্জিনের কোথাও কি যেন ফিট করছে একজন রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী। পা ধরে টেনে বের করে আনতে দেখা গেল লোকটার ডান হাতে টাইম বোমার পুরো একটা প্যাকেজ রয়েছে—বিস্ফোরক, ডিটোনেটর ও ঘড়ি। সে খুব বেকায়দা অবস্থায় ধরা পড়ে গেছে, তাসত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয়, প্রতিপক্ষকে খুন করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। বাম হাতটা গাড়ির তলা থেকে এইমাত্র বেরুচ্ছে, তাতে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল, ভাল করে লক্ষ্যস্থির না করেই ট্রিগারটা টেনে দিল—রানা মাথা নেড়ে নিষেধ করা সত্ত্বেও।

লোকটা ট্রিগার টানছে দেখে জুতোর ডগা দিয়ে পিস্তলের ব্যারেলটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে রানা। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী টের পেল না যে নিজেরই খুলি উড়িয়ে দিচ্ছে।

নির্জন রাস্তায় গুলিটা চাপা কাশির মত আওয়াজ করল। লাশটা টেনে এনে চওড়া ড্রেনে ফেলে দিল রানা, তারপর ছুটে এসে লাফ দিয়ে একটা দরজার ভেতর পড়ল। সামনে ছোট্ট বারান্দা। ও জানে এরপর কিচেন, প্রথম ও দ্বিতীয় করিডরের দু'পাশে দুটো করে মোট আটটা স্টোররুম, অফিস কামরা, সবশেষে দোকান ঘর—সব মিলিয়ে এই হলো ওদের ঐতিহ্য। তবে বারান্দায় উঠতেই পঞ্চম গাইডের হিসাবটা মিলে গেল। কিচেন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো টুপি মাথায় এক বর্মী ছাগল-দাড়ি। এক হাতে একটা ধূমায়িত চায়ের কাপ, অপর হাতটা জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে কোমরে জড়ানো হোলস্টার ছুঁয়ে আছে। অমায়িক হেসে সালাম দিল নিরস্ত্র রানা, ঝোঁকের বশে খালি হাতটা কপালের কাছে তুলে সালামের জবাব দিল লোকটা। খপ্ করে সেটা ধরে প্রচণ্ড এক মোচড় দিল রানা, তারপর নিজের ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর সবেগে নামিয়ে এনে মট করে ভেঙে দিল কব্জি আর কনুইয়ের মাঝখানের হাড়টা। চিৎকার করার সুযোগ দেয়নি, হাঁ করতেই দু'হাতে চেপে ধরেছে গলাটা। জ্ঞান হারাতে প্রায়

দেড় মিনিট সময় নিল সে। এতক্ষণে বামহাতের তর্জনী দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে থাকা কাপটা খসে পড়তে গেল । শূন্যেই ক্যাচ ধরল ওটা রানা, নামিয়ে রাখল মেঝেতে। লোকটার কোমরে জড়ানো বেল্টের সঙ্গে পরিচিত চাবির একটা গোছা ঝুলতে দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা, টান দিয়ে খুলে নিয়ে নিজের পকেটে ভরল।

শিকারি বিড়ালের মত নিঃশব্দে, পা টিপে কিচেনে ঢুকল রানা; এখনও জানে না কারা ওদের শত্রু, ওর জন্যে ঠিক কি ধরনের ফাঁদ তারা পেতে রেখেছে, কিংবা এরইমধ্যে কতটুকু ক্ষতি ওদের হয়ে গেছে।

আইএসআই জানে মাসুদ রানা ভয়ঙ্কর লোক, কাজেই তারা তো ওকে খুন করার জন্যে নিজেদের সেরা এজেন্টদেরকেই পাঠাবে। শাহিদা নাসরিন শুধু পিস্তল আর ছুরি ব্যবহারে দক্ষ নয়, সে তার উপস্থিত বুদ্ধি আর কূট-কৌশলকেও দুটো অতিরিক্ত হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। রানাকে খুন করা সহজ কাজ নয়, এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছে সে। দালানের পিছনে গাড়ি রেখে গেছে রানা, টের পাওয়ামাত্র বুঝে নিয়েছে কিছু একটা সন্দেহ হয়েছে রানার। চট্ করে গাড়িটায় টাইম বোমা ফিট করার জন্যে দু'জন রোহিঙ্গাকে পাঠিয়ে দেয় সে। অফিস কামরায় একা বসেছিল, কিন্তু একটা কান ছিল ওদিকেই। সাইলেন্সারের কাশির মত আওয়াজটা তাই পরিষ্কার শুনেছে। শুনেই বুঝে নিয়েছে এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে। এমনিতেই শত্রুকে ছোট করে দেখতে অভ্যস্ত নয় সে, আর এ তো হলো লাখে একজন–মাসুদ রানা।

গুলির শব্দ হবার পর দশ সেকেন্ডও বোধহয় পার হয়নি, সম্মুখ-যুদ্ধের আইডিয়াটা বাতিল করে দিয়ে রানাকে ফাঁদ পেতে ধরার সিদ্ধান্ত নিল নাসরিন। ইন্টারকমের সুইচ অন করে দোকান থেকে তিন রোহিঙ্গা সহকারীকে আসতে বলল সে। রবিন ও

মুকুলকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অফিস কামরায় চলে এলো তারা, দোকানের শাটার নামিয়ে দিয়ে এসেছে। নাসরিন দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল তাদেরকে। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা ঝড়ের বেগে কাজ শুরু করল।

কিচেনের কাছাকাছি একটা খালি স্টোররুমে আটকে রাখা হয়েছে শিউলিকে। রবিন আর মুকুলকে সেই রুমেই রেখে আসা হলো। শিউলির মত এদের মুখেও কাপড় গুঁজে দিল রোহিঙ্গারা, হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে রাখল।

কাজটা সেরে দ্রুত আবার অফিস কামরায় ফিরে এলো তারা। এরপর দরজার দিকে মুখ করে ফেলা একটা চেয়ারে বসল নাসরিন। এক সহকারী পকেট থেকে কয়েক প্রস্থ রশি বের করে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল তাকে। শুধু যে বাঁধল তা নয়, মুখের ভেতর একটা রুমালও গুঁজে দিল। সকাল থেকে ইন্টারোগেট করে তথ্যটা পেয়েছে নাসরিন—মাসুদ রানা শিউলিকে কখনও দেখেনি। তাই এখন সে শিউলির ভূমিকা নিয়ে ফাঁদে ফেলতে চাইছে রানাকে।

গুলির শব্দ হবার পর মিনিট দেড়েক পেরিয়েছে, অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলো তিন রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী, সরাসরি উল্টোদিকের একটা দরজার তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এটাও একটা স্টোররুম, কাঠের বাক্স আর চটের বস্তায় ভর্তি। ভেতরে ঢুকে কবাট বন্ধ করল তারা, তবে দরজায় তালা লাগায়নি। কবাটও একটু ফাঁক করে রাখল, ম্যাডাম নাসরিনের সংকেত পাওয়ামাত্র তারা যাতে পিস্তল হাতে অফিস কামরায় ছুটে যেতে পারে। কোন্ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে, নাসরিন তা আগেই ওদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে। অফিস কামরার দরজার কবাট ভিড়িয়ে দিয়ে এসেছে ওরা, একটু ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

ভেবেছিল কান পাততে হবে, কিন্তু তার দরকার হলো না। শব্দটা এমনিতেই পরিষ্কার শুনতে পেল তারা। হ্যাঁ, ওই তো! তবে তিন সন্ত্রাসীর মনেই প্রশ্নটা জাগল। এত জোরে কি কেউ

গোঙায়? শিকার, অর্থাৎ রানার মনে সন্দেহ জাগবে না? ইস্, এখন তো আর ম্যাডামকে সাবধান করারও সময় নেই!

গোঙানির প্রথম আওয়াজটা শুনে রানার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। তাছাড়া, বিপদগ্রস্তা তরুণীকে সাহায্য করতে কে কবে ইতস্তত করে? এক্ষেত্রে বরং অতি উৎসাহী হয়ে ওঠাটাই রীতি। আর সেই তরুণী যদি লাখে একটা সুন্দরী হয় তাহলে তো কথাই নেই। তবে নারী অপরূপাকে উদ্ধার করতে গিয়ে চমকাতে হলো বটে। চেয়ারের সঙ্গে হাত ও পা রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, নিজের চেষ্টায় প্রায় খুলেই ফেলেছে শিউলি, রানা শুধু তাকে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। একটা আঙুল রাখল রাঙা ঠোঁটে, কথা বলতে নিষেধ করছে।

বলাই বাহুল্য যে গোঙানির দ্বিতীয় জোরালো আওয়াজটা শুনেও রানার মনে কোন সন্দেহ জাগল না, বরং হাসি পেল। অনেক পেশাতেই অভিনয়-গুণ একটা সম্পদ, সেই সম্পদ বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে মাত্রা ছাড়ালে। এক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটছে।

অফিস কামরার দরজা ঠেলে আগেই ভেতরে ঢুকেছে রানা, চেহারায় উদ্বেগ ও ব্যাকুল ভাব ফুটিয়ে তুলে রমণী অপরূপার প্রায় ঢিলে হয়ে থাকা রশির বাঁধন খুলতে সাহায্য করল। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল ও, মুখ খুলতে নিষেধ করছে। দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে জড়িয়ে সিধে হলো সে, তারপর কোমরে আটকানো খাপ থেকে এক ঝটকায় বের করে রানার নাভি বরাবর চালিয়ে দিল ধারাল ছুরিটা।

এই হামলার জন্যে তৈরি ছিল রানা, তাসত্ত্বেও মেয়েটার ক্ষিপ্রতা বিহ্বল করে তুলল ওকে। ছুরি ধরা হাতের কব্জিটা ধরতে এক পলক দেরি করলে এই হামলাতেই জীবন-প্রদীপ নিভে যেতে পারত ওর। যাই হোক, কব্জিটা প্রচণ্ড শক্তিতে মোচড়াতে ছুরিটা

নাসরিন ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো; কিন্তু রানার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ শক্তি খাটিয়ে ওর মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে, সেই সঙ্গে সাহায্যের আশায় বর্মী রিঙলীডারকে ডাকল, 'উম্‌ম্‌! কুইক! কিল হিম!' চিৎকারটা তখনও থামেনি, রানার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটছে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল নাসরিন। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। তড়াক্ করে উল্টোদিকে লাফ দিয়ে ডেস্কের ওপর চড়ল, মাপ ঠিক করে কষে লাথি চালাল রানার মুখে। রানা ঝট করে মাথা সরিয়ে নেয়ায় লাথিটা লাগল না। হঠাৎ শিউরে উঠল নাসরিন। উম্‌ম্‌ আর তার দুই রোহিঙ্গা সঙ্গীর কাতর আর্তনাদই সেজন্যে দায়ী।

অফিস কামরার বাইরে, করিডরে, লড়াইটা এক তরফাই হচ্ছে। নাসরিনের সংকেত বা ডাক পেয়ে উম্‌ম্‌ আর তার সঙ্গীরা এক সেকেন্ডও দেরি করেনি, হাতে পিস্তল নিয়ে স্টোররুম থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া হকিস্টিকের তেলেসমাতি খেলা শুরু হয়ে গেল। স্টিক দুটো রয়েছে রবিন আর মুকুলের হাতে, ওদেরকে কাভার দিচ্ছে শিউলি, রানার কাছ থেকে পাওয়া পিস্তল নিয়ে।

অফিস কামরায়, ডেস্কের কিনারায় দাঁড়িয়ে, দক্ষ অ্যাক্রব্যাটের মত শারীরিক কসরৎ দেখাল নাসরিন–বিদ্যুৎ বেগে আরও একটা লাথি চালাল রানার মাথায়, লাগলে জুতোর ডগা খুলির ভেতর ইঞ্চিখানেক সেঁধিয়ে যেত। রানা ওকে জীবিত আটক করতে চাইছে, তার এই ধারণায় চিড় ধরল ওর হাতে ছুরি বেরিয়ে আসতে দেখে। যোগ্য একজন স্পাই পালাবার পথ খোলা রাখে, নাসরিনও রেখেছে। ডেস্কে থেকে লাফ দিল সে, এবারও পিছন দিকে। এই মুহূর্তে রানার চোখের সামনে আইএসআই এজেন্ট যেন রঙিন একটা প্রজাপতি–উড়ছে। জানালায় গরাদ বা গ্রিল নেই, টিনটেড গ্লাস ঝনঝন শব্দে বিস্ফোরিত হলো।

লাফ দিয়ে ডেস্ক টপকে কাঁচ ভাঙা জানালার সামনে ছুটে

এলো রানা। দেখল পাশের দালানের পাঁচিল টপকে রাস্তায় নেমে যাচ্ছে নাসরিন, চোখাচোখি হতে একটা আঙুল তুলে দেখে নেব বলে নিঃশব্দে শাসাল।

তিন

সেদিনই সন্ধ্যার দিকে কাসিম গাওয়া-র সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ হলো রানার। গাইড হিসেবে সৎ ও করিৎতকর্মা বলে সুনাম আছে তার। রানার ভাল লাগল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া, আর মন দিয়ে কথা শোনার মাথা কাত করা ভঙ্গিটা। ওর প্রশ্নের উত্তরে সে শান্ত সুরে জানাল, স্টীমার নিয়ে সাগর ধরে যেতে চাইলে প্রস্তুতির জন্যে দু'ঘণ্টা বেশি সময় দিতে হবে তাকে। আর গন্তব্য যদি তাভয় ও মার্গুই-এর মধ্যবর্তী বনভূমি হয়, নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে সঙ্গের লোকজন ভয়ে স্টীমার থেকে নামবে না। কিসের ভয়? কিসের আবার, জানের! ওদিকের আদিবাসীরা অন্য এলাকার কাউকে দেখলে হয়, অমনি ধরে নিয়ে গিয়ে দেবতার উদ্দেশে বলি দিয়ে দেয়। বাঘই হলো তাদের প্রধান দেবতা।

রানা তাকে বলল, 'এখন বাজে সাতটা, আমরা তাহলে রাত সাড়ে ন'টায় রওনা হব, কেমন? কোথায় যাচ্ছি, লোকজনদের সে-কথা এখুনি জানাবার দরকার নেই, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার হোটেল স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেল কাসিম গাওয়া। সোফা ছেড়ে রানাও দাঁড়িয়ে পড়ল, দ্রুত চোখ বুলাল প্রথমে হাতঘড়ি, তারপর টেলিফোনের ওপর। চোখ-মুখে

কোন ছাপ না পড়লেও, মনটা ওর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছে।

যে-কোন শত্রুতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে এক ধরনের খেলা, এবং প্রতিটি খেলা কিছু অলিখিত নিয়ম ধরে খেলতে হয়। গুপ্তচরবৃত্তি বা এসপিওনাজেও কিছু নিয়ম আছে। আইএসআই ক্যামোফ্লেজ নিয়ে থাকা বিসিআই-এর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান রানা এজেন্সির অফিস ঐতিহ্যে সশস্ত্র এজেন্ট ও খুনী পাঠিয়ে সেই নিয়ম ভেঙে মারাত্মক ফাউল করেছে। এই খেলায় যেহেতু কোন রেফারি বা আম্পায়ার নেই, তাই ফাউলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ শক্তিশালী হলে বদলা নেবে, আর দুর্বল হলে মার খেয়ে মার হজম করবে।

রানা এজেন্সির ইয়ানগন শাখার সবার মিলিত সিদ্ধান্ত–বদলা নেবে। তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে রানা। তাছাড়া, কিভাবে বদলা নিতে হবে তা তো বলে দিয়েছেই, ঝুঁকিবহুল আসল কাজটাও করে দিয়ে এসেছে। এখন সেই কাজের ফল কি হতে যাচ্ছে সেটা জানার সময়। সেজন্যেই একটু বেশি অস্থিরতা অনুভব করছে রানা।

কয়েক মাসের মধ্যে দু'বার হামলা হলো ঐতিহ্যে। কাজেই বাধ্য হয়ে ব্যবসাটা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। একটা ফাইভ স্টার হোটেলের শপিং সেকশনে অন্য নাম দিয়ে খোলা হবে রানা এজেন্সির ইয়ানগন শাখা। আপাতত ওই হোটেলেরই একটা স্যুইট ভাড়া নেয়া হয়েছে, রবিন ও মুকুলকে নিয়ে ওখান থেকে জরুরী কাজগুলো সারবে শিউলি। হোটেলের টেলিফোন যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে তাকে। রানা যোগাযোগ করতে পারে, তাই মিনি রেডিওটা খুলে রাখতে হবে।

দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই এজেন্সির ডিরেক্টর নির্ঘাত চাকরি খাবে, এই ভয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল শিউলি। ঘটল উল্টোটা। টেলিফোনে দম আটকে রেখে কথা বলায়, আবার কখনও হাঁপানোয় তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল রানা, বলল–এ থেকেই ও বুঝতে পারে, ঐতিহ্যে কিছু একটা ঘটেছে।

নাসরিনের তিন সহকারীকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে পুলিস। উম্‌ম্‌ আর তার দুই সহকারী পুরনো পাপী, দু'জনের নামে আট-দশটা করে খুনের মামলা ঝুলছে। পুলিস লাশ দুটোও উদ্ধার করল। দু'জনই জেলভাঙা কুখ্যাত কয়েদী ছিল। ইন্সপেক্টর ইয়ে কোইবু শিউলিকে আশ্বাস দিয়ে বলে গেছে, ওদেরকে যে উম্‌ম্‌ আর তার সঙ্গীরা খুন করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই– থানায় নিয়ে গিয়ে বেদম পিটিয়ে এই অপরাধ স্বীকারও করানো হবে। এ-কথা শুনে উম্‌ম্‌ কাতরকণ্ঠে শিউলিকে অনুরোধ করল, 'ইন্সপেক্টরকে বলুন আমাদেরকে যেন মারধর করা না হয়। কারণ একবার যে থানার মার খেয়েছে তার জীবন শেষ। আমরা এখনই স্বীকার যাচ্ছি–হ্যাঁ, ওই দু'জনকে আমরাই খুন করেছি।'

শিউলিকে কিছু বলতে হয়নি, মুচকি হেসে ইন্সপেক্টরই বলল, 'দেখলেন তো, ম্যাডাম! বর্মী পুলিসের মারের চোটে ভূতও জব্দ হয়, আর এ তো স্রেফ ডাকাত!'

স্মৃতি রোমন্থনে বাধা পড়ল। টেলিফোন বাজছে। রিসিভার তুলে প্রশ্ন করল রানা, 'ইয়েস?'

'মাসুদ ভাই, শিউলি। পাকিস্তানী এমব্যাসির কমার্স আট্যাশে মঈন মিনহাজকে ড্রাগ স্মাগলিং-এর অভিযোগে অ্যান্টি-নারকটিক স্কোয়াড এই মাত্র গ্রেফতার করল। ভদ্রলোকের গাড়িতে প্রায় এক কেজি হেরোইন পাওয়া গেছে। আরও একটা খবর আছে, মাসুদ ভাই, শুনে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।'

মঈন মিনহাজকে ফাঁসাবার জন্যে রানা এজেন্সিকে এই হেরোইন কিনতে হয়নি। গত হপ্তায় শিউলি একটা কেসের সুরাহা করেছে, তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট ফি তো পেয়েছেই, না চাইতে আরও পেয়েছে দশ কেজি হেরোইন কুখ্যাত ড্রাগ ডিলার মোয়াও মোয়া-র গোডাউনে হানা দিয়ে। বিখ্যাত এক শিল্পপতির স্ত্রীকে কৌশলে একটু একটু করে খাইয়ে হেরোইনে আসক্ত করে তোলে মোয়াও মোয়া, তারপর কথাটা ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে

ব্ল্যাকমেইল শুরু করে শিল্পপতিকে। পাইকারি খদ্দের সেজে মোয়াও মোয়া-র গুদামেই ফাঁদ পাতা হয়, সেই ফাঁদে ধরাও পড়ে শয়তানটা। তাকে ওখানে বেঁধে রেখে পুলিসকে ফোন করে শিউলি, তবে পুলিস পৌঁছাবার আগেই এক কেজি হেরোইন নিয়ে কেটে পড়ে। ওই হেরোইনই আজ কাজে লাগিয়েছে রানা। 'কি এমন খবর যে শুনে আশ্চর্য হয়ে যাব?' হাসছে ও।

'মঈন মিনহাজের গাড়িতে পাঁচ কোটি স্থানীয় টাকা পাওয়া গেছে। মাসুদ ভাই, ওগুলো জাল!'

'গুড গড!' রানা আসলেও বিস্মিত হলো। 'ওদের কমার্স আট্যাশেই স্পাই জানতাম, কিন্তু জানতাম না যে এরকম নীতিহীন অসৎ মানুষ।'

'যাই হোক,' বলল শিউলি, 'এ-কথা বলতেই হবে যে আমরা একটা ভাল কাজ করেছি, তাই না, মাসুদ ভাই?'

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'তবে, তোমাদেরকেও খুব সাবধানে থাকতে হবে, শিউলি।'

'জ্বী। মাসুদ ভাই, কাসিম গাওয়ার সঙ্গে আলাপ হলো?'

'হ্যাঁ। আমরা সাড়ে ন'টার সময় রওনা হচ্ছি,' বলল রানা।

'সড়ক পথে, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল শিউলি।

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি।' মিশনের নিরাপত্তার স্বার্থেই সত্যি কথাটা চেপে গেল রানা। 'রাখলাম, শিউলি। ফিরে এসে দেখা করব।'

হোটেলের বিল আগেই মিটিয়ে দিয়েছে রানা, ঠিক সাড়ে ন'টায় ব্রিফকেস হাতে নিচে নেমে দেখল পার্কিং এরিয়ায় দুটো জীপ নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে কাসিম গাওয়া, সঙ্গে আরও চারজন বর্মী লোক। জীপ দুটোয় পিকনিক বাস্কেট, রাইফেল, ন্যাপস্যাক ইত্যাদি আগেই তোলা হয়েছে।

ইঙ্গিতে রানাকে প্রথম জীপটায় উঠতে বলল কাসিম। ওটার

পিছনে আগেই উঠে বসেছে এক লোক। বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ. গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা; টিকালো নাক, মাথার পিছন দিকে দর্শনীয় টিকি, কপাল ও বাহুতে তিলক আঁকা—পুরোপুরি হিন্দু ব্রাহ্মণ মনে হলো। কাসিম জানাল, ভারতীয় বংশোদ্ভূত বর্মী রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে সে। কি ভেবে কে জানে এদিক ওদিক মাথা নেড়ে অসন্তোষ বা হতাশা প্রকাশ করল। ধুতির ওপর কোমরে জড়ানো হোলস্টারে একটা পিস্তল দেখল রানা, এতটাই বেমানান যে হাসি পেয়ে গেল।

কাসিম ড্রাইভিং সিটে বসল। পাশের সিটে রানা উঠতেই পায়ের কাছ থেকে একটা কাঠের বাক্স তুলে খুলল সে। ভেতরে কয়েকটা পিস্তল ও কয়েক বাক্স অ্যামিউনিশন রয়েছে। এক মুঠো বুলেট নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ভরল রানা। 'আর কিছু লাগবে না,' বলল ও। ইঙ্গিতে রাইফেল ও পিস্তলের বাক্সটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোর লাইসেন্স আছে তো?'

'পর্যটন মন্ত্রণালয় জানে আর্কিওলজিকাল সাইট দেখতে গেলে জঙ্গলের ভেতর বিদেশী ট্যুরিস্টদের ওপর হামলা হয়,' বলল কাসিম। 'ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছিল, তাই আমাদের সমিতি আন্দোলন করে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে।'

জীপ ছেড়ে দিল কাসিম। অপর জীপটা পিছু নিল। 'ওরা বেয়ারা,' বলল সে। তারপর ইঙ্গিতে পিছনে বসা লোকটাকে দেখাল। 'ওর নাম পণ্ডিত কুশল থুয়ে। ওর মত ভাগ্য দু'চার লাখে বড়জোর একজনের হয়।'

'কি রকম?' রানা কৌতূহলী হলো।

'বকদের নাম শুনেছেন কি, সার?' জানতে চাইল কাসিম, তবে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না। 'বক হলো হিংস্র, বর্বর একটা আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম, এখন শুধু তাভয় আর মাগুই-এর মাঝখানের গভীর জঙ্গলে বাস করে। ওদের হাতে অন্য কোন গোষ্ঠী বা

সম্প্রদায়ের লোক ধরা পড়লে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে না। আমাদের জানা মতে, একা শুধু এই পণ্ডিত কুশল থুয়ে ওদের হাতে ধরা পড়ার পরও জান নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে।'

'ইন্টারেস্টিং। গল্পটা আমাকে শোনাতে বলো।'

কুশল থুয়ের সঙ্গে কথা বলল কাসিম। ভাষাটা আঞ্চলিক ও অচেনা, কিচিরমিচির করে কি বলল বোঝা গেল না। 'মিস্টার রানা, সার,' কাসিম একটু বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, 'গল্পটা আপনাকে পরে এক সময় শোনাবে থুয়ে। বলছে, সব কথা স্মরণ করলে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে সে, তিন-চার ডিগ্রী জ্বরও উঠে যায়। তবে সে একজন সাধক, আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাধনা করে–বলছে, সেবার ওই সাধনার গুণেই বেঁচে যায় সে।'

'ঠিক আছে, পরে,' বলল রানা। 'তবে শুধু দুটো প্রশ্নের জবাব দিতে বলো। এক, ওর ভাষাটা কি? দুই, ও কি বকদের প্রাচীন মন্দিরটা দেখেছে?'

থুয়ের সঙ্গে কথা বলে কাসিম জানাল, 'জ্বী, সার। পণ্ডিত থুয়ে বলছে, মন্দিরটা সে চেনে। আর ভাষাটা হলো পাইপাই আদিবাসীদের। ইরাবতী নদীর মোহনার কাছে ওদের বাস, বেশিরভাগ বর্মী হিন্দু।'

'গুড।' রানা খুশি। 'তাহলে ও-ই আমাদেরকে পথ দেখিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাবে।'

আবার একটু বিব্রত হতে দেখা গেল কাসিমকে। 'সার, থুয়ে এখনও জানে না আমরা কোথায় যেতে চাই। কিন্তু জানার পর পুরোটা রাস্তা আমাদের সঙ্গে থাকবে সে, এরকম আশা করাটা ঠিক হবে না।'

'তাহলে ওকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রথম কারণ, সার, ওর এক হিন্দু বন্ধুর একটা পুরানো ফেরিবোট আছে, লীজ নেয়া, ইয়ানগন আর তাভয়ের মাঝখানে

আসা-যাওয়া করে। আমি ওর মাধ্যমে তাকে কিছু বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে তাভয় আর মাগুঁই-এর মাঝখানে কোথাও নামিয়ে দিতে বলেছি।'

'মন্দ নয়। সঙ্গে জীপ থাকলে পৌঁছাতে কম সময় লাগবে।'

মাথা নাড়ল কাসিম। 'থুয়ে বলছিল, কিছুদূর যাবার পর জীপ চালাবার মত রাস্তা পাওয়া যাবে না। তবে জীপ যেখানে থামবে সেখান থেকে মন্দিরটা মাত্র এক দিনের হাঁটা পথ।'

কাসিম গাওয়া গাইড হিসেবে যে কতটা কাজের লোক তার প্রমাণ পাওয়া গেল বন্দরে পৌঁছানোর পর। বন্দর পুলিস, কোস্টগার্ড ও কাস্টমসে তার লোক আছে, তিন সংস্থার লিখিত ছাড়পত্র যোগাড় করতে সময় লাগল মাত্র আধ ঘণ্টা। অন্যান্য আরও অনেক ট্যুরিস্ট সাগরপথে এদিক ওদিক আর্কিওলজিকাল সাইট দেখতে যাচ্ছে, তাদেরকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জেরায় জেরায় রীতিমত জর্জরিত করছে, কিন্তু কাসিম গাওয়া রানাকে জীপ থেকে নামতে পর্যন্ত দিল না।

ফেরিবোটে ওঠার পর রানাকে একটা কেবিনে বসিয়ে দিয়ে গেল কাসিম। একটু পরই রওনা হলো ওরা। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আন্দামান সাগর আজ রাতে শান্তই থাকবে। এক ঘণ্টা পর পিস্তলটা খুলে পরিষ্কার করছে রানা, থুয়েকে নিয়ে ওর কেবিনে ঢুকল কাসিম। 'কুশলকে আমি রাজি করিয়েছি, সার। সে আমাদেরকে মন্দিরটা দেখিয়ে দেবে। তবে সেজন্যে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে তাকে।'

'কত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'থুয়ে মার্কিন ডলার ছাড়া অন্য কোন টাকা নেবে না,' বলল কাসিম। 'ফেরির ভাড়া বাবদ ওর বন্ধু পাঁচশো ডলার চাইছে। মন্দির পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হলে ও চাইবে দু'হাজার ডলার।'

'বেয়ারাদের খরচ?'

'কুশলই দেবে,' বলল কাসিম। 'তবে ওরা যদি মাঝপথ

থেকে পালায় সেজন্যে তাকে দায়ী করা যাবে না।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে রানা বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। জিজ্ঞেস করো, ওই মন্দিরটা সম্পর্কে কি জানে সে।'

বেশ কিছুক্ষণ দ্রুত কথা বলে গেল কুশল থুয়ে। সে থামতে কাসিম বলল, 'ওই মন্দিরে বকদের সবচেয়ে বড় আর শক্তিশালী দেবতা ব্যাঘ্র মহাশয় অধিষ্ঠান করেন, তাই জায়গাটাকে বকেরা অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করে।'

রানা বলল, 'আমার কাছে খবর আছে, ওই মন্দিরে বাইরের কিছু লোকজন আশ্রয় নিয়েছে। এ বিষয়ে থুয়ে কিছু জানে?'

কাসিমের মাধ্যমে থুয়ে জানাল, সে কিছু উড়ো খবর পেয়েছে বটে, তবে তার কাছে নিরেট কোন তথ্য নেই।

কাসিমকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'মন্দিরের চারপাশে কতটুকু জায়গা বিপজ্জনক?'

খানিক চিন্তা করে কাসিম বলল, 'লম্বায় প্রায় দেড়শো কিলোমিটার আর চওড়ায় ষাট কিলোমিটার বনভূমি মোটেও নিরাপদ নয়। উত্তরে তাভয় আর দক্ষিণে মার্গুই, এই দুটো শহর অবশ্য নিরাপদ–সামরিক বাহিনী সারাক্ষণ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে আরেকটা জায়গা আছে, উপকূল ঘেঁষা, নাম কোকোব্যাং–ওটাকেও মোটামুটি নিরাপদ জায়গা বলা যায়।'

'কোকোব্যাং...আর্মি পোস্ট নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নেড়ে কাসিম বলল, 'না। ওদিকের বিশাল জঙ্গল কিনে নিয়ে এক অভিজাত জমিদার একটা খামারবাড়ি গড়ে তুলেছেন। শহরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আরও অনেক ব্যবসা আছে, কিন্তু বছরের পর বছর কোকোব্যাং ছেড়ে কোথাও তিনি যান না। কি কারণে জানি না, বকেরা আজ পর্যন্ত এই ভদ্রলোকের কোন ক্ষতি করেনি।'

কাল খুব সকালে ফেরি থেকে নামতে হবে, তাই রানাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলে থুয়েকে নিয়ে চলে গেল কাসিম।

পরদিন সকালে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে পণ্ডিত থুয়ের বন্ধু ফেরিবোট নিয়ে তাভয়ের দিকে চলে গেল। প্রথম পাঁচ মাইল চওড়া মেঠো পথ পাওয়া গেল, জীপ চালাতে কোন অসুবিধে হলো না। তারপর রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে উত্তর ও পুব দিকে চলে গেছে। উত্তরে গেলে তাভয় পড়বে, পুবে রয়েছে থাই-মায়ানমার সীমান্ত। তবে থুয়ের কথা শুনে কাসিম জানাল, পুবদিকে কিছু দূর যাবার পর আবার একটা শাখা পথ পাওয়া যাবে, সেই পথটাই বক আদিবাসীদের গ্রাম আর তাদের পবিত্র মন্দিরে পৌঁছে দেবে ওদেরকে।

কিন্তু এতই সরু যে শাখা পথে জীপ চালানো সম্ভব হলো না। অগত্যা জীপ দুটোকে ঘন ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে রওনা হলো ওরা। আরও সরু হতে হতে এক সময় শাখা পথটা অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলল। এক পাল বুনো শূয়োর দেখল ওরা, বন্য হাতির তাড়া খেয়ে দিগ্বিদিক্ ছুটছে। এদিকের গাছপালা পরস্পরের এত কাছাকাছি জন্মেছে যে নিচে নামার কোন সুযোগ পায়নি রোদ। ভর দুপুরকে মনে হচ্ছে গোধূলি। কাসিম ও থুয়ের হাতে ধারাল দা রয়েছে, পথ তৈরির জন্যে ওগুলো দিয়ে ঝোপ-ঝাড় কাটছে তারা। মাঝেমধ্যে স্থির হয়ে কান পাতছে থুয়ে, হাত তুলে সবাইকে শব্দ করতে নিষেধ করছে। কি শুনতে চাইছে সে-ই জানে। এক-আধ ঘণ্টা পরপর সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে জঙ্গলের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে দশ-পনেরো মিনিট পর। কি দেখে এলো, কি করে এলো–কাউকে কিছু বলছে না।

আবার যখন একা রওনা হলো থুয়ে, রানার ইঙ্গিত পেয়ে তার পিছু নিল কাসিম। কিন্তু হাত ইশারায় নিষেধ করল থুয়ে, আঞ্চলিক ভাষায় কি বলল বোঝা গেল না। কাসিম রানার কাছে ফিরে এসে জানাল, 'থুয়ে বলছে, নিরিবিলিতে ধ্যান করতে যাচ্ছে, কেউ সঙ্গে থাকলে বিঘ্ন ঘটবে। এই ধ্যান তার আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ, সামনে

কোন বিপদ থাকলে আগেভাগে টের পাবে সে।'

দুপুর একটায় থামার নির্দেশ দিল রানা। বেয়ারারা মাথার বোঝা নামাল। পিকনিক বাস্কেট থেকে বের করে প্লেটে খাবার সাজানো হচ্ছে। ধ্যান করার কথা বলে আবার ওদেরকে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল কুশল থুয়ে। এবার অনুমতি না চেয়েই তার পিছু নিল কাসিম।

এক কি দেড়শো গজ এগিয়ে একটা ঝোপের পাশে থামল সাধক বাবাজী কুশল থুয়ে। পিঠের ন্যাপস্যাক খুলে ছোট্ট একটা রেডিও বের করল সে। পরিষ্কার ইংরেজিতে কাকে যেন খবর দিচ্ছে। 'আমরা উত্তর দিক থেকে মন্দিরে পৌঁছাব। এটাই আমার শেষ মেসেজ, কারণ মাসুদ রানার মনে সন্দেহ জাগছে...'

'এই তোমার ধ্যান, থুয়ে?' ঝোপটার আরেক দিক থেকে বেরিয়ে এলো কাসিম। 'তোমার কাছে রেডিও কেন? খবরটা কাকে দিলে?'

রেডিও অফ করে চোখ ইশারায় কাসিমকে কাছে ডাকল থুয়ে। আশপাশে আর কেউ আছে কিনা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'তুমি গাইড হিসেবে যতটা বুদ্ধিমান, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের ব্যাপারে ঠিক ততটাই বোকা। কাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে? ওই মাসুদ রানা কে, জানো?'

চোখ পিট পিট করল কাসিম। 'কে?'

'কে বা কি, তা অবশ্য আমিও জানি না,' বলে নার্ভাস ভঙ্গিতে একটু হাসল সাধক থুয়ে। 'তা আসলে আমাদের জানার দরকারও নেই। তবে আমাকে বলা হয়েছে, ওই মাসুদ রানাকে জীবিত ধরে দিতে পারলে একটা মহল দশ লাখ মার্কিন ডলার নগদ পুরস্কার দেবে।'

'হোয়াট! বলো কি!' ঝোপের একটা ডাল ধরে নিজেকে সামলাল কাসিম। 'আমার মাথা ঘুরছে, পণ্ডিত!'

'সাবধান, মাথা ঘুরে আবার পড়ে যেয়ো না!' টিকি দুলিয়ে

হেসে উঠল থুয়ে। 'ওই টাকা অর্ধেক তোমার হাতে যাচ্ছে।'

'হে আল্লাহ, রহম করো!' কাসিম হাঁপাচ্ছে। 'ওহে পণ্ডিত, আমার যে দম আটকে আসছে!'

'নিজেকে সামলাও!' চোখ গরম করে ধমক দিল কুশল থুয়ে। 'শোনো, আমার পিছু নিয়ে এসে তুমি ভালই করেছ। তুমি না এলে আমি নিজেই তোমাকে ডাকতাম। ওই লোককে ফাঁদে ফেলা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমার সাহায্য লাগবে। ভাই কাসিম–তুমি মুসলমান আর আমি হিন্দু, কিন্তু তাতে কি–এসো, টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই। কি, রাজি তো?'

হঠাৎ তেড়ে মারতে এলো কাসিম। 'শালার ব্যাটা শালা! নেমকহারাম! পাপ করিয়ে আমাকেও তুই নরকে পাঠাতে চাস? আজ তোকে আমি খুনই করে ফেলব...'

'ধীরে, বৎস, ধীরে!' তিলকের ফোঁটাআলা অবয়বে বিজয়ীর হাসি, হাতে চলে আসা পিস্তল কাসিমের কপালের পাশে ঠেকাল আধ্যাত্মিক সাধক থুয়ে। 'এতই যখন শখ, যা, তোকে তাহলে জান্নাতুল ফেরদৌসে পাঠিয়ে দিই...'

'তাহলে আমিও তোমাকে রৌরব নরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বলল রানা, নিঃশব্দে ভণ্ড সাধকের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতের ওয়ালথার লোকটার কানের পাশে খুলিতে চেপে ধরল।

'ভুল করেছি! মাফ চাই!' পিস্তল আর রেডিও ফেলে দিয়ে অন্য সুর ধরল আধ্যাত্মিক সাধক। 'টাকার লোভে পাপ করতে যাচ্ছিলাম, কষে দু'চারটে লাথি মেরে আপদ বিদায় করে দিন। একা ফিরব, পথে যদি বকেরা ধরে বলি দিয়ে দেয়, সেটাই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে–ভগবানের তরফ থেকে।'

'ওকে সার্চ করো, কাসিম,' বলল রানা। 'খবরদার, কোনমতে যেন পালাতে না পারে।' কয়েকটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলল রেডিওটা।

সাধক বাবাজীকে সার্চ করে একটা ক্ষুর, একটা ছুরি আর

তিনটে মাদুলি পাওয়া গেল। কৌতূহলী কাসিম মাদুলির ভেতর সাদা পাউডার আবিষ্কার করল। 'তুমি তাহলে হেরোইনও খাও?'

নিজের কপালে চটাস করে চাটি মেরে পণ্ডিত কুশল বলল, 'আমি খাইনি, আমি খাইনি, বরং হেরোইনই আমাকে খেয়েছে।' অকস্মাৎ রানার পা ছুঁতে চেষ্টা করল সে। 'সার, আমার মত পাপিষ্ঠকে আপনি অভিশাপ দিন! জুতোপেটা করুন! তারপর ধাওয়া করুন, আমি যেন অন্ধের মত ছুটতে ছুটতে বাঘের মুখে গিয়ে পড়ি। কিংবা, সার, আমাকে আপনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিন...'

'বিপজ্জনক চরিত্র, সার!' হঠাৎ হেসে উঠল কাসিম। 'সার্চ করার সময় টের পেলাম ওর সুন্নত, অর্থাৎ মুসলমানী করানো হয়েছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ব্যাটা ব্রাহ্মণ তো নয়ই, এমনকি হিন্দুও নয়!'

পা ছুঁতে না দিয়ে একটু পিছিয়ে এসেছে রানা, হাতের পিস্তল এখনও কুশল থুয়ের দিকে তাক করা। 'সত্যি কথা বলো, থুয়ে। তুমি আইএসআই-এর স্থানীয় এজেন্ট, তাই না? হিন্দু ব্রাহ্মণ বা সাধক আসলে কাভার, ঠিক? ফেরিবোটটার মালিক আইএসআই, তোমাকে দিয়ে গালফ অভ থাইল্যান্ড থেকে হেরোইন সংগ্রহ করানো হয়। তুমি সেই হেরোইন আন্দামান সাগর দিয়ে এনে ইয়ানগনে পৌঁছে দাও।'

'জ্বী, হুজুর! আপনাদের প্রতিটি অভিযোগ সত্য!' হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে থুয়ে, ধুতির প্রান্ত দিয়ে শুকনো চোখ মুছছে ঘন ঘন। 'আমাকে আপনি শাস্তি দিন, সার!'

'তোমার আসল নাম কি?'

'ইয়াসিন, হুজুর। ইয়াসিন থুয়ে। আমি একজন রোহিঙ্গা।'

'তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরে সিদ্ধান্ত নেব আমরা,' বলল রানা। 'আগে তুমি মন্দিরটা দেখাও।'

'জ্বী, সার। অবশ্যই দেখাব।'

কাসিম বলল, 'কিন্তু মন্দিরে আমরা উত্তর দিক দিয়ে যাব

না।'

ইয়াসিন দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। 'ছি-ছি! জেনে শুনে আমি ওদের ফাঁদে ফেলব তোমাদের! নিজের প্রাণের ওপর আমার কি কোন মায়া নেই?' আড়চোখে রানার হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে তাকাল সে।

'কাসিম,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা, 'যদি দেখো পালাচ্ছে বা কোন রকম চালাকি করছে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।'

'ইয়েস, সার।'

আধ ঘণ্টা পর আবার রওনা হলো ওরা। ইয়াসিনকে নিয়ে সামনে থাকল কাসিম। মাঝখানে তিন বেয়ারা। সবার শেষে রানা। রওনা হবার আগে বেয়ারাদের জানানো হয়েছে, পণ্ডিত কুশল ওদের সবার জন্যে মারাত্মক দুঃসংবাদ, কারণ সে ওদেরকে হিংস্র বকদের হাতে তুলে দিতে চায়, কাজেই তার ব্যাপারে সবাইকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। বেয়ারাদের প্রায় উলঙ্গ করে সার্চও করেছে কাসিম। তিনজনের কাছ থেকেই একটা করে ছুরি পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল সরু তার, দুই প্রান্তে কাঠের হাতল সহ। ওই তার গলায় পেঁচিয়ে দু'দিকে টান দিলে দেড়-দু'মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। বেয়ারারা জানাল, পণ্ডিত কুশল বা ইয়াসিনের সঙ্গে তাদের কোন চুক্তি হয়নি, কারও কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েও তারা আসেনি—ছুরি আর তার তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে সঙ্গে রেখেছে।

বেলা তিনটের দিকে গোলমাল শুরু করল ইয়াসিন। আবার সে নতুন করে দাবি করল, সত্যি তার আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। এই শক্তি সে সাধনার মাধ্যমে অর্জন করেছে। সেই শক্তিবলে বিপদের আগমনী বার্তা পাচ্ছে সে। কাজেই আর সামনে এগোনো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মন্দিরে ওরা উত্তর দিক থেকে পৌঁছাবে না, তাই অনেকটা

ঘুর পথ ধরে এগোতে হচ্ছে। সন্ধ্যার আগে মন্দিরের দেখা মিলবে না, ফলে এমনিতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে রানার, ইয়াসিনের শয়তানী আরও খেপিয়ে তুলল ওকে। কাসিমকে আসতে বলে ইয়াসিনের পাশে চলে এলো ও। পিস্তলের মাজল দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল পাঁজরে, বলল, 'তুমি আসলে বেয়ারাদের ভয় দেখাতে চাইছ, মাথার বোঝা ফেলে ওরা যাতে পালায়। কিন্তু ওরা পালাচ্ছে দেখলে ওদেরকে নয়, তোমাকে গুলি করব আমি।'

মনে মনে রানাকে স্বীকার করতে হলো, ইয়াসিনের মত বেহায়া আর নোংরা নাটুকে চরিত্র জীবনে আর একটাও দেখেনি ও। কথাটা শুনে ওর নয়, বেয়ারাদের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে গেল সে, বলছে, 'তোরা আমার মা-বাপ লাগিস, ভাই! কথা দে পালাতে চেষ্টা করে আমাকে খুন করবি না।'

ল্যাং মেরে তাকে ফেলে দিল রানা। তা না হলে বেয়ারারা হোঁচট খেত, মাথার বোঝা ছিটকে পড়ত মাটিতে।

ইয়াসিন সিধে হয়ে হাঁটা ধরল আবার। ফোঁপাচ্ছে। রানা বুঝতে পারছে, শয়তান লোকটার আচরণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছে বেয়ারাদের। কিন্তু কিছু করার নেই।

শব্দটা মৃদুই, পিছনে কেউ একজন একটু দ্রুত শ্বাস নিল। বন করে আধপাক ঘুরল রানা। প্রথম বেয়ারার মুখে নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল, চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাঁ করা মুখ থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। হাঁটু আগেই ভাঁজ হতে শুরু করেছিল, সটান সামনের দিকে আছাড় খেলো। গলার ফুটো থেকে রক্ত ঝরছে, ফুটোয় এখনও বিঁধে রয়েছে ছোট্ট তীর–একটু একটু কাঁপছে।

'শুয়ে পড়ো!' লোকটার স্থির শরীরের পিছনে আড়াল নিয়ে নিজেও শুলো রানা, এখনও জানে না হামলাটা কোন্ দিক থেকে করা হয়েছে। ওর দু'ফুট সামনে নরম মাটিতে মুখ গুঁজে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ইয়াসিন।

'সার, সাবধান!' ঠিক সময় মত চিৎকার করল কাসিম।

শরীরটা গড়িয়ে দিচ্ছে রানা, বাতাসে শিস কাটার মৃদু শব্দ ঢুকল কানে—আরেকটা তীর বিঁধল মরা লোকটার গায়ে। হাতে আগেই বেরিয়ে এসেছে, একটা গাছের ওপর দিকে ঘুরে গিয়ে পরপর তিনবার গর্জে উঠল ওয়ালথারটা। চাপা একটা গোঙানির শব্দ হলো, তারপর গাছের উঁচু ডাল থেকে খসে পড়ল একটা বহুরঙা শরীর। লোকটার মুখে ও গায়ে বিচিত্র নকশা আঁকা। নিহত বেয়ারার ক্যানভাস ব্যাগটা টেনে নিয়ে মাথাটাকে আড়াল দিল রানা, তারপর চোখ ঘুরিয়ে ঝোপ ও গাছপালার ভেতর শত্রু খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল বাকি দু'জন বেয়ারাকে ইঙ্গিতে শুয়ে থাকতে বলছে কাসিম। লোক দু'জন বোঝা ফেলে হামাগুড়ি দিচ্ছিল, ঝোপের ভেতর লুকাতে চায়।

আরও একটা খসখস আওয়াজ শুনে বন করে মাথা ঘোরাল রানা। আরেকজন বহুরঙা আদিবাসী। গাছের ডালে বসে ধনুক তুলে লক্ষ্যস্থির করছে। গর্জে উঠল ওয়ালথার, লোকটা খসে পড়ল। কাসিমের হাতেও পরপর দু'বার হাঁচি দিল ল্যুগারটা, কাছাকাছি গাছ থেকে আরেকজন রঙচঙে বক ধরাশায়ী হলো। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার দিল একজন বেয়ারা, লাফ দিয়ে সিধে হয়ে পিছন দিকে ছুটল। পাঁচ গজও এগোতে পারল না, ঘাড়ে তীর বিঁধতে দড়াম করে পড়েই স্থির লাশ হয়ে গেল। তীরের ডগায় যে বিষই ব্যবহার করুক তারা, সন্দেহ নেই যে বুলেটের চেয়েও মারাত্মক সেটা। রক্তের সংস্পর্শে আসা মাত্র মৃত্যু। ব্যাপারটা আরও রোমহর্ষক এজন্যে যে এই মৃত্যু আসে প্রায় নিঃশব্দে।

রানা ভাবছে, ইয়াসিন আগেই নাসরিনকে জানিয়ে দিয়েছে যে মন্দিরে আসছে ও। আর এখন গুলির শব্দে সে জেনে যাবে ঠিক কোথায় রয়েছে ওরা।

ক্রল করে রানার পাশে চলে আসছে কাসিম। তৃতীয় বেয়ারা দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে চোখ রাঙিয়ে নিষেধ করল সে। তার এই এক

মুহূর্তের ব্যস্ততার সুযোগ নিল ইয়াসিন। লাফ দিল সে, হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে কাসিমের পিস্তলটা ধরার জন্যে। সে শূন্যে থাকতেই গুলি করল রানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে ফুটবলের আকৃতি পেল শরীরটা। একটা ঝোপের পাশে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। তারপর স্থির হয়ে গেল। রানা ও কাসিম সেদিকে তাকিয়ে আছে, তৃতীয় বেয়ারা ছুটল—দ্বিতীয় লোকটার মত পিছন দিকেই। সে-ও পাঁচ-সাত গজের বেশি যেতে পারল না, পিঠে তীর নিয়ে আছাড় খেলো।

মাথা তুলে অপেক্ষায় ছিল রানা ও কাসিম, কোন দিক থেকে তীর আসবে দেখতে চায়। দু'জনের হাতেই গর্জে উঠল যার যার পিস্তল। বিশ গজ দূরের একটা গাছ থেকে আরেক বক খসে পড়ল নিচে।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল ওরা। প্রায় দশ মিনিট পর মাথা তুলে চারদিকে চোখ বুলাল। নিস্তব্ধতা একটা মোড়কের মত ঘিরে রেখেছে ওদেরকে। এমন কি পোকামাকড়, পাখি বা বুনো প্রাণীরাও কোন শব্দ করছে না।

বসল কাসিম, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের পাশে ছোট্ট ক্ষতটার রক্ত মুছল। 'হয় ওরা সবাই মারা গেছে,' বলল সে, 'নয়তো আরও লোক আনার জন্য ফিরে গেছে।' মাটি থেকে একটা ন্যাপস্যাক তুলে পিঠে ঝুলিয়ে নিল সে।

'মন্দিরটা এখান থেকে আর কতদূরে, আন্দাজ করতে পারো?' দাঁড়াল রানা, কাঁধে একটা ন্যাপস্যাক ঝুলিয়ে নিয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

'হিসাব তো বলে না কাছাকাছি কোথাও হবে।' কাঁধ ঝাঁকাল কাসিম, চেহারায় হতাশার ছাপ। রানার পাশে হাঁটছে সে।

'তুমিও ভয় পেয়ে পালাবার কথা ভাবছ নাকি হে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছি-ছি, কি বলেন, সার!' হাসল কাসিম। 'ঐতিহ্য সারা বছর ক্লায়েন্ট দিয়ে সাহায্য করে আমাকে, সেজন্যেই বাল-বাচ্চা নিয়ে

প্রায় রাজার হালে বেঁচে আছি। আপনি হলেন সেই ঐতিহ্যের মালিক–কি বলেন পালাব, প্রয়োজনে জান দিয়ে দেব না!'

'দুঃখিত, কাসিম, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমার মন এত মরা কেন?'

'বাহিনীটা খুব ছোট হয়ে গেল, সার,' বলল কাসিম। 'বকেদের বিরুদ্ধে আমরা দু'জন কিছুই করতে পারব না।'

'শুধু বক নয়, কাসিম, আরও শক্তিশালী একদল শয়তান লোকের সঙ্গে লড়তে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ছিল বিপদ আর ঝুঁকির কথা শিউলি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছে।'

'উনি বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি শুনতে চাইনি,' বলল কাসিম। 'মিস্টার রানা, সার, আমি আপনার সেবক হিসেবে এসেছি–আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করব, ব্যস।'

কাসিমের কাঁধে একটা হাত রেখে রানা বলল, 'তোমার ভুল হচ্ছে, কাসিম। কে বলল আমার একজন সেবক দরকার? আমি বরং চাইব তুমি আমার বন্ধু হবে। আর সেজন্যেই সব কথা তোমার শোনা দরকার।'

পাঁচ-সাত সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কাসিম, তারপর নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল রানা। ওর ধারণা, পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই আদিবাসী বকদের মন্দিরে একটা শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করেছে, উদ্দেশ্য মইনুল হাসানের থিওরি ও ফর্মুলার সাহায্যে বাদল চৌধুরীকে দিয়ে একটা ডাইভার্টার মেশিন বানানো, তারপর সেই মেশিনের সাহায্যে নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ চীনের একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল হাইজ্যাক করা। অ্যাটম বোমা কেউ শখ করে হাইজ্যাক করে না। আইএসআই, অর্থাৎ পাকিস্তান নিশ্চয়ই কোথাও ফেলবে ওটা। যেখানেই ফেলুক, লাখ লাখ মানুষ

অবশ্যই মারা যাবে। কোটি মানুষ মারা যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তো, এই মহা সর্বনাশ ঠেকাবার জন্যেই মায়ানমারে এসেছে রানা, বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে।

রানা থামতে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল কাসিম গাওয়া। 'আছি, সার, আপনার সঙ্গে আছি। আরেকটা হিরোশিমা? প্রাণ থাকতে নয়!'

প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটার পর হঠাৎ সামনে ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পেল ওরা। জঙ্গলের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখছে। খালি জায়গা, পাথর দিয়ে তৈরি করা একটা চুলো ছাড়া কিছু নেই। লম্বা চওড়ায় সমানই হবে, প্রায় পঞ্চাশ ফুট। গাছ আর ঝোপ কেটে এই জায়গা বের করা হয়েছে, কাটা ঝোপ আর গাছ এখনও স্তূপ হয়ে রয়েছে কিনারায়।

রানার ইশারা পেয়ে ফাঁকা জায়গাটার ওপর চোখ রেখে এগোল কাসিম, জঙ্গল থেকে কেউই ওরা বেরুচ্ছে না। কয়েক ফুট এগিয়ে একবার করে থেমে কান পাতছে রানা। ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে সবুজ গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেন নিশ্ছিদ্র পাঁচিল, তারপরও উল্টোদিকে একটা ফাটল বা ফাঁক মত কিছু একটা রানার চোখে ধরা পড়েছে। ঘুর পথ ধরে সেদিকেই যাচ্ছে ওরা।

উল্টোদিকে পৌঁছে সরু একটা পথ দেখতে পেল ওরা, পথের দু'পাশের ঝোপের কিছু ডাল ভাঙা। অর্থাৎ এই পথ দু'একদিন আগেও ব্যবহার করা হয়েছে।

অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। দু'জনের হাতেই পিস্তল তৈরি। পঞ্চাশ গজ, তারপর একশো গজ এগোল। পথটা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। প্রতিটি বাঁকে উত্তেজনা, শিহরণ আর আকস্মিক বিপদের ভয়। হঠাৎ থেমে ঘন ঝোপের ভেতর ন্যাপস্যাক ফেলে দিল রানা, দেখাদেখি কাসিমও।

আরও একশো গজ পেরিয়ে এলো ওরা। গাছের ছোট একটা

গুঁড়িতে পা পড়ল রানার, অর্ধেকটা পচা, সারা গায়ে পিঁপড়ে ঘুরছে। বাতাসে চাবুকের মত সপাং করে শব্দ হতেই বুঝল ভুল করে বসেছে। শরীরের নিচ থেকে কেউ যেন টান দিয়ে ছিনিয়ে নিল পা দুটো। মাথা নিচু হয়ে গেল, শরীরটা ঝুলছে। এটা একটা রশির ফাঁদ, ফাঁসটা জুতো পরা পায়ে আটকেছে। পা ওপরে আর মাথা নিচে থাকায় দুনিয়াটা উল্টো লাগছে। কাসিমকে এক পলকের জন্যে দেখতে পেল ও-কপালের পাশে শুকনো রক্তের জায়গায় তাজা রক্ত গড়াচ্ছে। রশির প্রান্তে ঝুলছে রানা, রশিটা ঘুরছে-হঠাৎ দেখল মোটা একটা লাঠি ওর মাথা লক্ষ্য করে তোলা হয়েছে। আঁতকে উঠল রানা। এই বাড়ি যদি লাগে, নির্ঘাত মগজ বেরিয়ে পড়বে।

চার

রানার অনুভূতি হলো, খুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চোখের পিছনে ব্যথা যেন ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে। দৃষ্টি পথে সব কিছু ঝাপসা, সবুজাভ আর লালচে। পেশি ঢিল করে দিয়ে চেতনা ধরে রাখার চেষ্টা করছে ও। কারও চলাফেরার খসখস আওয়াজ ঢুকছে কানে, ফিসফিস করে কারা যেন কথাও বলছে। রশির সঙ্গে পাক খাচ্ছে রানা, তবে গতিটা মন্থর হয়ে আসছে। চোখ দুটো সামান্য একটু ফাঁক করল ও।

দৃষ্টি পরিষ্কার হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। জগৎটা যে উল্টো, এটা বুঝতেও কিছু সময় পার হলো। মাটিতে পড়ে রয়েছে

কাসিম, লাঠির বাড়ি লাগায় কপালটা ফুলে উঠেছে। নড়ছে না। চারদিকে তাকাল রানা। কেউ নেই, অন্তত কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এখন আর কোন শব্দও হচ্ছে না। কি কারণে বলা মুশকিল, একটু আগে যারা ছিল তারা চলে গেছে। এখনও ফাঁদে আটকা, তবে এই মুহূর্তে প্রাণ হারাবার আশঙ্কা নেই। হামলাকারীরা হয় জানতে গেছে, ওদেরকে নিয়ে কি করতে হবে; নয়তো পচে মরার জন্যে জঙ্গলে ওদেরকে ফেলে রেখে চলে গেছে।

তবে রানার কাছে ছুরি থাকতে পচে মরতে হবে কেন? কব্জি ঝাঁকিয়ে বাহুর সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা তালুতে নিয়ে এলো ও। রশি কেটে নিজেকে মুক্ত করতে এক মিনিটও লাগল না। তবে মাটিতে পা রেখে দাঁড়াল ঠিকই, দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। শক্তি ও সুস্থতা অবশ্য একটু পরই ফিরে পেল রানা। স্বস্তি বোধ করল কাসিমের পালস পরীক্ষা করে। কপালের ক্ষতটা গভীর নয়, হাড় ভাঙেনি। জ্ঞান ফিরে আসছে। নিজের ওয়ালথার আর কাসিমের ল্যুগারটা খুঁজল ও, কিন্তু কোথাও পেল না।

'কি ঘটেছিল?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল কাসিম।

'তা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।' প্রথমে উঠে বসতে, তারপর দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা কাসিমকে। 'আগে এখান থেকে কেটে পড়ি চলো।'

পরিস্থিতিটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিল কাসিম। 'চলুন ঝোপটার কাছে ফিরি আগে, হাতে অস্ত্র থাকা দরকার। পথ ছেড়ে এগোতে হবে, তা না হলে আমাদেরকে ওরা স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেলতে পারে,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে পথ ছেড়ে তার পিছু নিল রানা। ওর মাথার ভেতর যেন কেউ ড্রাম পেটাচ্ছে, এত ব্যথা।

সশস্ত্র হবার পর আগের জায়গায় ফিরে এলো ওরা, সেখান থেকে আরও দশ মিনিট নিঃশব্দে হাঁটল, পাঁচ-সাত গজ পরপর একবার করে থেমে বোঝার চেষ্টা করছে কেউ ওদের ওপর নজর

রাখছে কিনা। তা যদি কেউ রেখেও থাকে, ওদের চোখে ধরা পড়ছে না। রানার মনে আছে, তীর-ধনুক ও লাঠি হাতে হামলা শুরুর আগে দু'দল লোককে দেখতে পায়নি ওরা।

দাঁড়িয়ে পড়ল কাসিম, একটা হাত তুলল। সেই হাত অনুসরণ করে সারাসরি সামনে মন্দিরটা দেখতে পেল রানা।

প্রকাণ্ড কাঠামো, পিরামিড আকৃতির পাথুরে প্যাগোডা; শ্যাওলা আর আগাছায় ঢাকা, ওদের মাথার ওপর টাওয়ারের মত কয়েকশো ফুট খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, চূড়ার দিকটা পিতলের পাত দিয়ে মোড়া। ডান ও বাম পাশে একশো ফুট উঁচুতে প্রকাণ্ড মাঠের মত সমতল খোলা ছাদ। অথচ একটু পিছিয়ে এলে গাছপালার আড়াল থাকায় আকাশ ছোঁয়া কাঠামোটা দেখাই যায় না। এটাকে মন্দির বা প্যাগোডা যাই বলা হোক, মায়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় আবিষ্কৃত অন্যান্য আর্কিওলজিকাল সাইট যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে, এটার বেলায় তা করা হয়নি। রানা শুনেছে গোটা মায়ানমারের বিভিন্ন জঙ্গলে এমন শত শত প্রাচীন মন্দির ছড়িয়ে আছে, যেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সভ্য জগতের মানুষ এখনও কিছু জানে না, জানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন করে আদিবাসী, যারা শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ ওগুলো দেখতে পেয়েছে। সন্দেহ নেই, এই প্রাচীন মন্দিরটাও সে-ধরনের একটা। চুপিসারে বসে গভীর ষড়যন্ত্র পাকাবার জন্যে এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না।

ধাতব কিছুতে লেগে ঝিক্ করে উঠল রোদ, গাছের ফাঁক দিয়ে রানা দেখল পিরামিডের মাথায় একটা রুপালি পোল খাড়া করা রয়েছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রাডারস্কোপ-এর পুরো আকৃতিটা ধরা পড়ল চোখে। রানার মনে পড়ল, ডাইভার্টার মেশিনের কাছ থেকে নিখুঁত সার্ভিস পেতে চাইলে পাওয়ারফুল রাডারস্কোপ-এর প্রয়োজন আছে, ওটার সাহায্যে আকাশের যে-কোন বস্তুকে সহজে চেনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফিসফিস করল রানা, 'ভেতরে ঢোকার উপায় কি, কাসিম?'

দুই ভুরু এক করল কাসিম। 'ঢোকার পথ তো অনেকগুলোই থাকার কথা। সার, আমি ভাবছি ভেতরে ঢোকার পর কি ঘটবে।'

'মানে?'

'বেশিরভাগ বড় বড় প্যাগোডার ভেতর অসংখ্য গলি-উপগলি থাকে, সার—গোলকধাঁধাই বলতে পারেন। একবার পথ হারালে জীবনে আর বেরুতে পারবেন না।'

হেসে ফেলল রানা। প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'ভেতরে একদল শয়তান লোক মহা এক অন্যায় কাজে ব্যস্ত, কাজেই নিশ্চয়ই তারা চারদিকে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে। কোত্থেকে নজর রাখছে বলতে পারো?'

'বাইরে থেকে। নিশ্চয়ই ওরা জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে। ভেতর থেকে সম্ভব নয়, কারণ দেয়ালগুলো কাত হয়ে আছে, মন্দিরের গোড়ার দিকে দৃষ্টি ফেলতে পারবে না। দরজা বা গেটের মুখে পাহারা থাকাটাই স্বাভাবিক। ভেতরে—' কাঁধ ঝাকাল কাসিম '—যে-কোন জায়গায়, এমন কি প্রতিটা বাঁকেও থাকতে পারে।'

'আমি দেখছি, তুমি আমাকে কাভার দাও,' বলল রানা

লম্বা একটা তাল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কাসিম। রওনা হবার আগে ল্যুগারটা রিলোড করে নিল রানা। ঘাম আর কাসিমের রক্তে ভিজে গেছে ওর শার্ট। মাথার ভেতরটা এখনও দপ্‌দপ্ করছে।

ঝোপের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে রানা, চোখ দুটো সারাক্ষণ মন্দিরের দিকে। কিন্তু প্রবেশ পথ বা প্রহরী, কিছুই চোখে পড়ল না।

পিরামিডের একদিকের দেয়াল পুরোটা দেখা শেষ করল রানা। এবার আরও সতর্ক, ধীরে ধীরে মন্দিরের পিছন দিকে যাচ্ছে। কে জানে, ওটাই হয়তো সামনের দিক। ঘোরা শেষ হতে দেখল, ভিতর বা গোড়া থেকে বেশ কয়েক ফুট পর্যন্ত জঙ্গল কেটে সাফ করা হয়েছে। ঘাস ও ঝোপগুলো কেটে-ছেঁটে সুন্দর

রাখার চেষ্টাও চোখে পড়ল। আশপাশের ঝোপ ও গাছের পাতায় মিহি ধুলো জমেছে। সন্দেহ নেই, লোকজনের আসা-যাওয়া আছে এদিকে।

একটা নারকেল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেয়ালটার পুরো দৈর্ঘ্যের ওপর চোখ বুলাল রানা। পায়ে হাঁটা সরু পথগুলো মাঝামাঝি একটা জায়গায় মিলিত হয়েছে বলে মনে হলো। পাথুরে দেয়ালের গায়ে গাঢ় একটা ছায়াও দেখতে পেল রানা। ভেতরে ঢোকার পথ?

চোখে বিনকিউলার তুলে মন্দিরটাকে ঘিরে থাকা গাছপালার দিকে তাকাল রানা। কিন্তু শাখায় শাখায় এত বেশি পাতা যে কেউ লুকিয়ে থাকলে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। ঝুঁকি নিয়েই এগোতে হবে ওকে।

পিস্তলটা নাভির পাশে বেল্টে গুঁজে রেখেছে রানা। এগোবার সময় শত সাবধানতা সত্ত্বেও ঝোপগুলোর শুকনো ডাল ওর চারপাশে পটকার মত শব্দ করে ভাঙতে লাগল। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছালে আওয়াজ কম হবে, তবে টার্গেট হিসেবেও সহজ হয়ে উঠবে ও।

প্রবেশপথটা এখন চিনতে পারছে রানা। এখনও প্রায় দুশো ফুট দূরে ওটা। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে আশপাশের গাছে চুপ হয়ে গেছে পাখিগুলো। তবে দরজাটা ভাল করে দেখার জন্যে দাঁড়াতেই আবার যে যার মিষ্টি গলার ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এখনও কোথাও কোন গার্ড দেখতে পাচ্ছে না রানা। যেন জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী বর্কেরাই যে-কোন বহিরাগত আগন্তুকদের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

পরিবেশটা দুর্বোধ্য লাগছে রানার। পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই, ঝোপের আড়াল থেকে ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে আসতে হলো। যা কিছু ঘটছে, সব ওই মন্দিরের ভেতর। কাজেই ওখানে ঢোকার কোন বিকল্প নেই।

ফাঁকায় বেরিয়েছে রানা দম আটকে। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক।

তা সত্ত্বেও প্রথমে বুঝতেই পারল না লোকটা কোত্থেকে এলো। ওপর থেকে পড়ল সে, রানার বাম দিকের একটা গাছে বসে ছিল। ঝাপসা নড়াচড়ার তাৎপর্য মস্তিষ্ক অনুধাবন করার আগেই ধরে ফেলল রানাকে।

তার হাত পিছন থেকে বেড় দিয়ে ধরল রানাকে, ওর হাত শরীরের সঙ্গে আটকা পড়ল। অন্তত চার ইঞ্চি বেশি লম্বা রানা, কিন্তু লোকটার শরীর যেন শান দেয়া ইস্পাত। বুক ভরে বাতাস নিয়ে কুঁজো হলো রানা, তবু লোকটাকে পিঠ থেকে খসানো গেল না। ঘুরতে না পারলে পিস্তলটা কোন কাজে আসবে না। তাছাড়া, মন্দিরের এত কাছে এসে গুলির শব্দ করাটা বোকামিই হবে। পেশি ঢিল করে নেতিয়ে পড়ল রানা। অকস্মাৎ ওর ওজন সামলাতে হওয়ায় হোঁচট খেয়ে এক পা সামনে বাড়ল লোকটা। সামান্য এই সুবিধেটুকুই দরকার ছিল রানার। আরও একটু নিচু হয়ে ডান পায়ের গোড়ালি সবেগে পিছন দিকে চালাল। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা, ঢিল দিল হাত দুটোয়। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিল রানা, শরীরটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরল, পিস্তল চলে এসেছে সামনে। কুঁজো হয়ে রয়েছে লোকটা, মাথায় পিস্তলের বাড়ি খেয়ে ঢলে পড়ল ঘাসের ওপর।

কিছু শুনেছে কিনা নিশ্চিত নয়, ঝট করে ঘুরল রানা। ঘুরতেই একটা বর্শা দেখল, ওর পিঠে গাঁথতে যাচ্ছিল। ধরা পড়ে যাওয়ায় বর্শার মালিক পিছু হটল, তারপর কুঁজো হয়ে আবার এগোল। লোকটা উলঙ্গ বললেই চলে, শুধু উরুসন্ধিতে এক টুকরো চামড়া ঝুলছে। তবে মাথায় পট্টি আছে। সেই পট্টিতে পাখির পালক গোঁজা। কোমরে আরও একটা জিনিস দেখল রানা—সোনার বিছে। অতটা চওড়া না হলেও, গলায় পুরু সোনার চেইনও পরেছে। মুখে উজ্জ্বল রঙের নকশা আঁকা। হাতের বর্শাটা চার ফুট লম্বা, ফলে রানার খুব কাছে আসার সুযোগ নেই তার। আবার ছোঁড়ার জন্যে যথেষ্ট পিছিয়ে গেলেও সমস্যা, আঘাত করার

আগেই ওটাকে আরেক দিকে সরিয়ে দিতে পারবে রানা।

লোকটার চোখে-মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। এমন কি রানার হাতের পিস্তলটাকেও সে গ্রাহ্য করছে বলে মনে হলো না। হয়তো ভাবছে পিস্তল ব্যবহার করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে ওর। সে তো আগেই দেখেছে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গীকে রানা গুলি করেনি। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে একটু সামনে বাড়ল লোকটা, তারপর সবেগে ছুঁড়ল বর্শাটা। দ্রুত গতির কারণে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা গেল না। মাথাটা ঝট করে নামিয়ে, শরীর মুচড়ে জায়গা করে দিল রানা; ওর কাঁধের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বর্শার ফলা। পরমুহূর্তে টের পেল, বর্শাটা ছিল ডাইভারশন–লোকটা ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে, বাহু দুটো মেলে দেয়া, দুই হাতে ধরে আছে সরু একটা কর্ড। রানা বাধা দেয়ার সময় পেল না, মালার মত কর্ডটা ওর গলায় পরিয়ে দিল সে। তারপর টান দিল দু'দিকে, শরীরের সমস্ত শক্তি কাজে লাগাচ্ছে।

রানা অনুভব করল মাংস কেটে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সরু কর্ড। অন্ধকার নামছে চোখের সামনে। অক্সিজেনের প্রচণ্ড চাহিদায় মাছের মত নিঃশব্দে খাবি খাচ্ছে। জ্ঞান হারালে আর কিছু করার থাকবে না। পিস্তলটা নরম কোথাও ঠেকল, ঠিক কোথায় জানে না রানা। লোকটা আরও শক্তি জড়ো করছে হাতে, শেষ একটা টান দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে। আর দেরি করা যায় না, ট্রিগার টেনে দিল রানা।

গুলির আওয়াজ ভোঁতা শোনাল কানে। আসলে রানার মাথার ভেতর এত শব্দ হচ্ছে, পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে গেলেও শুনতে পাবে কিনা সন্দেহ। ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল কর্ডে, সেটা ছেড়ে দিয়ে রানার পায়ের কাছে ঢলে পড়ল লোকটা। রানা হাঁপাচ্ছে। একটু সুস্থির হতে দেখল গুলিটা জায়গা মতই লেগেছে–বগলের নিচে। সরাসরি হার্ট ফুটো করে আরেক দিকের পাঁজরে গিয়ে আটকে

আছে বুলেটটা।

কিন্তু গুলির শব্দে আরও চারজন বক হাজির। তারা কোনরকম ব্যস্ততা দেখাল না। যে যার বর্শার ডগা বাড়িয়ে দিল শুধু। কারও বর্শা রানার বুক স্পর্শ করল, কারওটা শিরদাঁড়া। এরাও সোনার অলঙ্কার পরে আছে—কোমরে বিছে, গলায় চেইন, হাতে বালা।

চারজন ঘিরে রাখল রানাকে, তবে কেউই কাছে এলো না বা ওর গায়ে হাত দিল না। শুধু নিজেদের সঙ্গে হাঁটতে বাধ্য করল ওকে।

মন্দিরের ভেতরটা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে। আধো অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। একটা টানেলের ভেতর রয়েছে ওরা, মেঝেটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে। ছাদটা নিচু, শিরদাঁড়া বাঁকা করে হাঁটতে হচ্ছে রানাকে। দেয়ালে হোল্ডার আছে, প্রতিটি হোল্ডারে একটা করে মশাল জ্বলতে দেখল ও। সামনের একজন বক গার্ড হোল্ডার থেকে খুলে একটা মশাল হাতে রাখল।

কাসিম ঠিকই বলেছে, অন্তত বকদের এই মন্দিরের ভেতরটা অসংখ্য টানেলের সমষ্টি, রীতিমত একটা গোলকধাঁধা। প্রতি পাঁচ-সাত গজ পরপর একটা করে প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছে রানা, অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। তবে দু'পাশের দু'একটা টানেলে মশাল জ্বলতেও দেখা গেল।

একটা হিসাব রাখার চেষ্টা করল রানা—কোন দিকে যাচ্ছে, কতবার বাঁক নিল, দেয়ালে কি কি চিহ্ন দেখল। খানিক পর হাল ছেড়ে দিল, সব গুলিয়ে ফেলেছে। মেঝে আগের মতই, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথার ব্যথাটা সেরে গেছে ওর। একজন গার্ডের নগ্ন কোমরে চামড়ার বেল্ট জড়ানো রয়েছে, ওর ল্যুগারটা সেই বেল্টে গোঁজা। তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে না যে সে ওটা ব্যবহার করতে জানে। জঙ্গলের লোক এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারা কেউই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপারে

তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি। বকেরা তাদের পূর্ব-পুরুষদের অস্ত্রই বেশি পছন্দ করে।

সরু একটা টানেলে ঢুকল ওরা। এরপর এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো। সামনের গার্ড দশ ধাপ এগিয়ে আছে। পাঁচ ফুট পিছন থেকে পিছনের একজন ওর পিঠে বর্শার ডগা দিয়ে খোঁচা দিল। এদিকের বদ্ধ বাতাস গরম লাগছে। উঠছে তো উঠছেই, ধাপগুলো শেষ হতে চাইছে না। একশো পর্যন্ত গুনল রানা। তারমানে প্রায় আশি ফুট ওপরে উঠেছে ওরা। ওঠা-নামার পথ এই একটাই কিনা কে জানে।

ছোট আরেকটা প্যাসেজ হয়ে প্রকাণ্ড এক কামরায় ঢুকল ওরা। কামরা না বলে গুহা বললেই যেন বেশি মানায়, সারি সারি পাথুরে থাম সিলিঙের অবলম্বন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। থামগুলোর গায়ে খোদাই করা নকশা বা বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—সোনার অলংকারে মোড়া বীর যোদ্ধারা তীর-ধনুক বা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বায় কামরাটা সত্তর ফুটের মত, চওড়ায় তার অর্ধেক। দেয়াল থেকে বেশ কয়েকটা জ্বলন্ত মশাল ঝুলছে। কালো ধোঁয়া ওপরে উঠে অদৃশ্য ভেন্টিলেটর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দূর প্রান্তে নিচু একটা প্ল্যাটফর্ম দেখা যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা পাথুরে পায়ার ওপর, দখল করে রেখেছে কামরার প্রায় অর্ধেক দৈর্ঘ্য। প্লাটফর্মের ওপর দুটো মূর্তি। বকদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় দেবতা ওগুলো—ব্যাঘ্র মহাশয়। একটা পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। আরেকটা ছাঁচে ফেলে সোনা দিয়ে গড়া। দুটো বাঘেরই চোখে মূল্যবান রত্ন ব্যবহার করা হয়েছে—সম্ভবত হীরেই হবে।

বক গার্ডরা মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে দেবতাকে প্রণাম করল।

জায়গাটাকে বক গার্ডরা এতই নিরাপদ মনে করছে, এদিক ওদিক হাঁটাচলা করছে দেখেও রানাকে তারা বাধা দিল না। কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার আরও দুটো পথ দেখল রানা,

প্রতিটিতে একজন করে গার্ড আছে।

গার্ডদের লীডার প্ল্যাটফর্মে উঠে সবার শেষে দেবতাকে প্রণাম করল। তারপর পিছিয়ে নেমে এলো সে, রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে বাকি গার্ডদের উদ্দেশে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

এখন তিনজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে রানাকে। ছুরি দিয়ে একজনকে ঘায়েল করা কোন সমস্যা নয়, ভাবছে ও, কিন্তু সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই বাকি দু'জনের বর্শার ফলা নির্ঘাত খুঁজে নেবে ওকে। উঁহুঁ, অপেক্ষা করে দেখতে হবে এরপর কি ঘটে।

সিঁড়ির ধাপে ও প্যাসেজে খসখস পায়ের শব্দ হলো। চতুর্থ গার্ড আরও তিনজনকে নিয়ে ফিরে আসছে। পোশাক বদল হলেও দশ লাখে একটা সুন্দরীকে রানার কেন, কারুরই চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়। ওকে দেখে সকৌতুকে হাসল শাহিদা নাসরিন। 'তো, মাসুদ রানা, তোমার তাহলে শিক্ষা হয়নি? মরার এতই শখ যে স্বেচ্ছায় যমের বাড়ি চলে এলে?'

নাসরিনের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে চিনতে পারায় রানার কাছে নাসরিনের গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেল। এ-ও নাসরিনের মত আইএসআই এজেন্ট, মেজর শাকিল। বছর আড়াই-তিন আগে বাংলাদেশ ও ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তে সশস্ত্র উলফা গেরিলাদের ট্রেনিং দেয়ার দায়িত্ব পালন করছিল শাকিল, রানার তাড়া খেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরের বছরও বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গাদের নিয়ে ষড়যন্ত্র পাকাবার চেষ্টা করে সে। সেবার রানা তাকে বন্দী করতে পারলেও, ধরে রাখতে পারেনি। বিডিআর ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লোকটা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

'হ্যাঁ,' মুচকি একটু হেসে নাসরিনের প্রশ্নের জবাব দিল রানা, 'পুরানো পাপীদের ভিড় দেখে যমের বাড়ি বলেই মনে হচ্ছে এটাকে।'

'শাট আপ!' কর্কশ গলায় ধমক দিল মেজর শাকিল। 'শোনো রানা, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম...'

'তোমরা?'

মেজর শাকিল হাসল, 'ডক্টর ইমরান এলাহি। ডক্টর সাখাওয়াত সরদার। ডক্টর গোলাম মুস্তাকিম। ওঁরা তিনজনই নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। আরও আছেন ডক্টর কামাল হায়দার। ডক্টর বিল্লাল হুসেন। এঁরা দুজন অ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন, মিসাইল এক্সপার্ট।' একটু থেমে আবার হাসল সে। 'ওঁরা সবাই এখানে কি করছেন, তা তুমি খুব ভাল করেই জানো, রানা। জানো, তবে আংশিক—আমরা তোমাদের কারিগরি জ্ঞান নিয়ে ডাইভার্টার মেশিনটা বানাচ্ছি। কিন্তু কেন বানাচ্ছি, ওই মেশিন দিয়ে কি করা হবে, তা তোমরা জানো না।'

'সত্যি জানি না,' বলল রানা। 'জানাতে আপত্তি আছে?'

'জানলে, আমাদেরকে, অর্থাৎ আইএসআই তথা পাকিস্তানকে তোমরা শত্রু হিসেবে দূরে ঠেলে না দিয়ে বুকে টেনে আদর করবে,' বলল মেজর শাকিল। ইঙ্গিতে নাসরিনকে দেখাল সে। 'তখন নাসরিনও তোমার জান কবচ করার জন্যে অস্থির হবে না, বরং তোমার একটু ভালবাসা পাবার জন্যে...'

'থাক, থাক,' বাধা দিল রানা। 'কাজের কথা হচ্ছিল, তাই হোক। মেশিনটা দিয়ে কি করা হবে বলে ফেলো, শুনি, দেখি তোমাদেরকে বুকে টেনে নেয়ার কোনও উৎসাহ বোধ করি কি না।'

'সেটা জানাবার অধিকার আমাকে দেয়া হয়নি, রানা,' বলল মেজর শাকিল। 'বিজ্ঞানীদের লীডার ডক্টর ইমরান এলাহি প্রয়োজন মনে করলে তোমাকে জানাবেন।

সে থামতে নাসরিন বলল, 'বিজ্ঞানীরা আপাতত ক'টা দিন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন, রানা। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, পালাবার কোন চেষ্টা কোরো না।' তৃতীয় পাকিস্তানীর

দিকে তাকাল সে। 'মেজর এহ্সান, রানার কাছে এখনও অস্ত্র আছে। একটা ছুরি। সার্চ করে বের করে নাও ওটা।'

ছুরিটা হাতছাড়া হওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেল রানার। তবে মুখের হাসিটা ম্লান হতে দিল না। 'ডক্টর ইমরান এলাহির সঙ্গে কখন দেখা হবে আমার?' শাকিলকে জিজ্ঞেস করল ও। লক্ষ করল, ছুরিটা বক গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিল মেজর এহ্সান। ওর পিস্তলটাও তার কাছেই রয়েছে।

'ডক্টর এলাহি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ,' জবাব দিল মেজর শাকিল। 'সময় করতে পারলেই দেখা করতে চাইবেন।' তার ইঙ্গিতে দু'জন গার্ড এগিয়ে এসে ধরল রানাকে, কামরার আরেক দরজা দিয়ে সরু প্যাসেজে বের করে আনল ওকে। কয়েক মুহূর্ত পর অন্ধকার একটা ঘরের ভেতর ঠেলে দেয়া হলো, কোন রকমে তাল সামলে পতনটা ঠেকাল রানা। লোহার দরজা ঘটাং করে বন্ধ হয়ে গেল।

পাঁচ

মেঝেতে কি যেন ঘষা খাচ্ছে, সাপ মনে করে রানার শরীর শিরশির করে উঠল। পকেট হাতড়াতে একটা দেশলাই পাওয়া গেল। কাঠির অল্প আলোয় কুণ্ডলী পাকানো এক লোককে দেখতে পেল রানা, শার্ট ও ট্রাউজারে রক্ত লেগে রয়েছে। 'কে আপনি?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা।

আরেকটা কাঠি জ্বালল রানা। এবার আর চিনতে অসুবিধে

হলো না। এই ভদ্রলোকের ছদ্মবেশ নিয়েই ভারত, কাশ্মীর ও পাকিস্তানে গিয়েছিল রানা; প্রফেসর মইনুল হাসান, তাঁর স্ত্রী ও ওঁদের সন্তান নেহালকে উদ্ধার করে আনতে। ইনি প্রফেসর হাসানের সহকারী, বাদল চৌধুরী। নেহালের সঙ্গে তাঁকেও কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে এসেছে আইএসআই। 'আপনাকে ওরা বন্দী করে রেখেছে?' রানা অবাক। 'আমার তো ধারণা ছিল আপনাকে দিয়েই ডাইভার্টার মেশিন বানাচ্ছে ওরা।'

বাদল চৌধুরী ক্রল করে রানার পাশে চলে এলো। 'আপনার ধারণা ঠিকই আছে। আমাকে দিয়েই ডাইভার্টার মেশিন বানাবার প্ল্যান করেছিল ওরা। কিন্তু ফর্মুলা আর থিওরি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব সামান্য বলেই জানত ওরা, তাই প্রফেসর হাসানের সাহায্য আদায় করার জন্যে নেহালকেও কিডন্যাপ করে।'

'এ-সব আমরা জানি। তারপর কি হলো?'

'তারপর সার, মানে প্রফেসর হাসান, ইচ্ছে করে ভুল-ভাল কারিগরি তথ্য পাঠাতে শুরু করলেন। আমি তো প্রথম থেকেই ব্যাপারটা ধরে ফেললাম। ডাইভার্টার মেশিনের নামে বানাতে শুরু করলাম ঘোড়ার ডিম। কিন্তু তারপরই পাকিস্তান থেকে চলে এলো একদল বিজ্ঞানী। তারা দেখেই বুঝে ফেলল সারের পাঠানো কারিগরি তথ্য বেশিরভাগই ভুল। শুধু তাই নয়, আমিও যে ডাইভার্টার মেশিন বানাচ্ছি না, এটাও তারা বুঝে ফেলল।'

'এখন কি অবস্থা?'

'এখন আমি ডাইভার্টার মেশিন বানাতে বাধ্য হচ্ছি,' বেসুরো গলায় বলল বাদল চৌধুরী। 'রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে সারকে জানানো হয়েছে তাঁর চালাকি ধরা পড়ে গেছে, এরপরও তিনি যদি ভুল তথ্য দেন, নেহালের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা একটা করে কেটে কুরিয়ার সার্ভিসে করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'প্রফেসর এখন তাহলে নির্ভুল ইনফরমেশনই পাঠাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অন্ধকারে মাথা নাড়ল বাদল চৌধুরী। 'জ্বী-না। ছেলে মারা যাবে, এটাকে তিনি গুরুত্বই দিচ্ছেন না, সেই আগের মতই ভুল তথ্য পাঠাচ্ছেন, বলছেন-এগুলোই সঠিক।'

'আর আপনি কি করছেন?'

'আমি সারের মত মহৎ নই, মিস্টার রানা,' ম্লান সুরে বলল বাদল চৌধুরী। 'আমার মনটাও খুব দুর্বল। পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা বলেছে, মেশিন বানাতে ভুল করলে ওরা তা ধরতে পারবে, আর ধরতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুলে দেয়া হবে বকদের হাতে।'

'কেন? বকদের হাতে তুলে দেয়া হবে কেন?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, মিস্টার রানা...'

লম্বা কাহিনীটা সংক্ষেপে এরকম: প্রচণ্ড খরা আর দাবানলে বক আদিবাসীদের নিরাপদ আশ্রয় এই গহীন বনভূমি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছিল। পুরোহিতরা জানাল, দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে নিয়মিত নরবলি না দেয়ার কারণেই এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এই সময় বকদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো রোহিঙ্গারা। তারা বলল, বহু দূর এক দেশের কিছু লোক তোমাদের মন্দিরের সংস্কার করতে উৎসাহী। এখানে তারা বিদ্যুৎ তৈরি করবে, দেবতাদের বিশাল আকারের মূর্তি বানাবে, এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে নরবলি দেয়ার জন্যে বাইরে থেকে নিয়মিত মানুষও ধরে এনে দেবে। বিনিময়ে মন্দিরে কিছুদিন আশ্রয় চায় তারা। কোন একটা গুহার ভেতর একটা কারখানা বানিয়ে সেখানে কিছু তৈরি করবে-কিছু না, জাদু দেখানোর একটা যন্ত্র মাত্র।

আদিবাসী বকদের পুরোহিতরা সভায় মিলিত হয়ে আলোচনা করল। রোহিঙ্গাদের প্রস্তাবে রাজি হলো তারা, তবে শর্ত দিল কয়েকটা। প্রথম শর্ত, তাদের জঙ্গলে বা মন্দিরে পঞ্চাশজনের বেশি বিদেশী লোক থাকতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত, বৈদ্যুতিক

আলো প্রয়োজন হলে তৈরি করুক, কিন্তু তা শুধু নিজেরা ব্যবহার করবে, মন্দিরের অন্য কোথাও বা বাইরের জঙ্গলে ব্যবহার করা যাবে না। তৃতীয় শর্ত, বিদেশী কোন লোককে বকেদের গ্রামের ত্রিসীমানায় দেখা গেলে, বিষাক্ত তীর খেয়ে মরতে হবে তাকে।

তো বকেদের হাতে বলির পাঁঠা হয়ে মরার চেয়ে ডাইভার্টার মেশিন বানিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়েছে বাদল চৌধুরীর। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে সে। আর বড়জোর দিন দুয়েকের কাজ বাকি আছে।

'আপনার কাপড়চোপড়ে রক্ত কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাসরিন নামে এক ডাইনী আর শাকিল নামে এক পিশাচ রোজ বিকেলে লাথি ঘুসি মেরে নাক-মুখ ফাটিয়ে দেয় আমার।'

'কি বলছেন! কেন?'

'বিনা অপরাধে, মিস্টার রানা!' এবার কেঁদেই ফেলল বাদল চৌধুরী। 'বিজ্ঞানী ডক্টর এলাহির কাছে অভিযোগ করেছিলাম। শালা বুড়ো হাসতে হাসতে কি জবাব দিয়েছে শুনবেন? এরকম মার খেলে আমি নাকি ডাইভার্টার মেশিনে ত্রুটি রাখার সাহস পাব না।'

রানা জানে, তবু নিশ্চিত হতে চাইল। 'ডাইভার্টার মেশিন দিয়ে কি করবে পাকিস্তান, কিছু বলেছে?'

'না, এ বিষয়ে ওরা আমার সঙ্গে কোন আলাপ করেনি,' বলল বাদল চৌধুরী। 'তবে নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে, কান পেতে সব শুনি আমি। ওদের ধারণা আমি উর্দু জানি না।'

'নিজেদের মধ্যে কি আলাপ করে ওরা?'

'তেরো তারিখে নাকি দিল্লি নামে কোন রাজধানী দুনিয়ার বুকে থাকবে না,' নিজের অজান্তেই বাদল চৌধুরীর গলা খাদে নেমে গেল। 'আপনি জানেন, তেরো তারিখে চীন একশো মেগাটনের একটা পারমাণবিক বোমা টেস্ট করতে যাচ্ছে? ওটা একটা মিসাইল বয়ে নিয়ে যাবে, মিস্টার রানা। পাঁচ হাজার মাইল

পাড়ি দেবার কথা ওই আইবিএম-এর। কিন্তু তা ঘটবে না। আমার তৈরি ডাইভার্টার মেশিনের সাহায্যে ওটাকে দখল করে নেবে পাকিস্তানীরা।'

রানাও প্রবল উদ্বেগে ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'ডাইভার্টার মেশিনটায় ইচ্ছে করলে আপনি কোন ক্রটি রাখতে পারেন না?'

'পারি। এক-আধটু ক্রটি রেখেছিও। কিন্তু কাজটা ভাল করিনি।' অন্ধকারে মাথা নাড়ল বাদল চৌধুরী। 'এই ক্রটি পাকিস্তানী এক্সপার্টরা ধরে ফেলতে পারে। তখন আমাকে বকেদের হাতে তুলে দেবে। তাছাড়া, এখন আমি যদি বাকি কাজটুকু করে দিতে না চাই, তাতেও ওদের কোন সমস্যা হবে না। একটু বুদ্ধি খাটালে শেষটুকু ওরা নিজেরাই করে নিতে পারবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রসঙ্গ পাল্টে রানা জানতে চাইল, 'নেহালকে কোথায় রাখা হয়েছে জানেন?'

'না। অনেকবার জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পাইনি। বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে।'

এক মিনিট কাটল। রানা চিন্তা করছে। 'শুনুন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'চিৎকার করে গার্ডকে ডাকুন,' বলল রানা। 'গার্ড এলে বলবেন, ডক্টর ইমরান এলাহির সঙ্গে দেখা করতে চান আপনি।'

'গার্ড বলবে দেখা হবে না,' ভবিষ্যদ্বাণী করল বাদল চৌধুরী। 'তাছাড়া, তাতে লাভ কি?'

'লাভ কি তা এখনও জানি না,' বলল রানা। 'তবে অ্যাকশন চাই আমি। গার্ড যদি বলে দেখা হবে না, তখন আপনি বলবেন–ডাইভার্টার মেশিনে একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল রয়ে গেছে, সেটা এখুনি সংশোধন করা জরুরী। দেখবেন, গার্ডরা ঠিকই এই কামরা থেকে বের করে নিয়ে যাবে আপনাকে। আপনি অবশ্য

বলবেন, আমাকে ছাড়া আপনি যাবেন না। ঠিক আছে? পারবেন?'

'বাইরে বেরুবার সুযোগ পেলে আপনি কি পালাবেন? মানে পালাবার চেষ্টা করবেন?' ইতস্তত করছে বাদল চৌধুরী।

'আমি পালাব বলে মন্দিরে ঢুকিনি,' বিরক্তি চেপে বলল রানা। 'আমি ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে এসেছি, আপনাদের দু'জনকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাব। তবে কিভাবে বা কখন, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, আপনার কথামত গার্ডকে ডাকছি আমি,' রাজি হলো বাদল চৌধুরী। 'কোথায় ভুল করেছি দেখাতে না পারলে নাসরিন আর শাকিল আমার পিঠের ছাল তুলবে–কি আর করা, সহ্য করব!'

কিন্তু পাঁচ মিনিট ধরে ডেকেও গার্ডের সাড়া পাওয়া গেল না। বাদল চৌধুরী এ-কথাও বলল যে ডাইভার্টার মেশিনের ক্রটিটা এখনই মেরামত করা না হলে সংক্রামক ব্যাধির মত মেশিনের আরও অনেক যন্ত্রাংশে ক্রটিটা ছড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধ দরজার বাইরে থেকে কেউ সাড়া দিল না।

ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেল বাদল চৌধুরী। আরও প্রায় দশ মিনিট পর দরজার বাইরে বুট জুতোর আওয়াজ এসে থামল। 'আমি মেজর শাকিল,' শুনতে পেল ওরা। 'ডক্টর চৌধুরী, এত গোলমাল করছেন কেন?'

মেশিনে ক্রটি, পুনরাবৃত্তি করল বাদল চৌধুরী। এবার দরজা খুলে গেল। মেজর শাকিলের সঙ্গে মেজর এহসানও রয়েছে। 'আসুন, ডক্টর চৌধুরী,' বলল শাকিল। 'ডক্টর এলাহি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'মিস্টার রানাও আমার সঙ্গে যাবেন,' বলল বাদল চৌধুরী। 'ডক্টর এলাহিকে উনিও কিছু বলতে চান।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মেজর শাকিল বলল, 'ঠিক আছে, আমার পিছু নিন। এহসান, রানার ওপর চোখ রাখো।'

মোষের মত রঙ ও আকার, মেজর এহসান কোদাল আকৃতির দাঁত বের করে হেসে গোঁফে চাড়া দিল। হাতের পিস্তল দিয়ে রানার পাঁজরে জোরে একটা খোঁচা মারল সে। ছোট প্যাসেজ ও গুহার মত বড় কামরাটার ভেতর দিয়ে এগোল ওরা, বেরিয়ে এলো আরেকটা চওড়া টানেলে। এটার দেয়ালে খানিক পর পর একটা করে মশাল জ্বলছে। বেশি লম্বা নয়, তবে পাহারা খুব কড়া। পাকিস্তান আর্মির চারজন সৈনিক, দেখেই চিনতে পারল রানা। রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে শ্বাপদের ঠাণ্ডা ও স্থির দৃষ্টি। আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো। সব মিলিয়ে পনেরোটা ধাপ। এরপর যে প্যাসেজটা পড়ল সেটা সরাসরি একটা বিশাল কামরা পর্যন্ত চলে গেছে, এর আগে দেখা বড় কামরাটার চেয়ে আকারে প্রায় দ্বিগুণ হবে এটা।

দেখেই বোঝা যায় কামরাটাকে সম্প্রতি বড় ও মজবুত করা হয়েছে। পাথুরে সিলিং-এর অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইস্পাতের বীম, সিলিং আর পাথরের দেয়ালে সাদা টিউব লাইটের ছড়াছড়ি। কামরাটা দিনের মত আলোকিত। অস্পষ্ট হলেও, জেনারেটর-এর যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে রানা।

সন্দেহ নেই এটা একটা কারখানা। শুধু কারখানা নয়, ল্যাবরেটরিও বটে। ইস্পাতের তৈরি বিরাট আকারের ভারী ও জটিল অনেক ধরনের মেশিন যেমন আছে, তেমনি আছে টেস্ট টিউব, ফ্লাস্ক, জার, বকযন্ত্র ইত্যাদি। লম্বা একটা টেবিল তো আছেই, সেটা থেকে কয়েকটা ওঅর্কবেঞ্চ বেরিয়েছে। আরেক দিকের দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে বড়সড় একটা কন্ট্রোল প্যানেল, অনেকটা বোয়িং প্লেনে যেমন থাকে, তবে আকারে এটা আরও বড় ও জটিল মনে হলো। প্যানেলটার সামনের অংশে রয়েছে বিশাল এক আলোকিত স্ক্রীন, স্ক্রীনের গায়ে ফুটে আছে গোটা পৃথিবীর বহুরঙা মানচিত্র। স্ক্রীনটার নিচে ও দু'পাশে শত শত সুইচ, ডায়াল, মিটার, লিভার ও হুইল দেখা যাচ্ছে। এই

মেশিন বা যন্ত্র আগেও দেখেছে রানা, কাজেই চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। এটা প্রফেসর মইনুল হাসানের যুগান্তকারী আবিষ্কার ডাইভার্টার মেশিনের হুবহু নকল, আইএসআই-এর চাপে বাদল চৌধুরী তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে। ওটার পাশে একই আকৃতির আরও কয়েকটা মেশিন রয়েছে, প্লাস্টিক শীট দিয়ে ঢাকা থাকায় রানা চিনতে পারল না।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারজন পাকিস্তানী সৈন্য। মেজর এহসান পিস্তল দিয়ে আবার খোঁচা মারল রানাকে। চৌকাঠ পেরিয়ে কামরার ভেতর ঢুকল রানা। টেবিলে বসা প্রৌঢ় এক লোককে সালাম দিল মেজর শাকিল। প্রৌঢ় লোকটার চেহারায় আভিজাত্য আছে। চোখে মোটা লেন্সের চশমা, দাড়ি-গোঁফ আর মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। এক গাদা স্কেচ ও ডিজাইনের ওপর ঝুঁকে ছিল, মুখ তুলে তাকাল। সালামের কোন জবাব না দিয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'হারামজাদ উও চোদ্‌রি কিধার হ্যায়? উ শালা বাঙ্গাল গাদ্দারি কিয়া, একদাম ডুবা দিয়া। ইয়ে ডিজাইন মে ভি গলত্‌ হ্যায়...'

অন্যান্য ওঅর্কবেঞ্চে আরও চার-পাঁচজন পাকিস্তানী বিজ্ঞানী কাজ করছে, দেখতে তারা ভারতীয় সিনেমার খল-নায়কদের মত। তাদের কাজ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে বা স্রেফ মনোযোগের সঙ্গে দেখছে এক লোক। তাকে দেখে এমন চমকানোই চমকাল রানা–নিজেকে নির্দয় তিরস্কার তো করলই, সঙ্গে সঙ্গে চট করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ওর প্রতিক্রিয়া কেউ লক্ষ করল কিনা।

অথচ লোকটাকে শুধু চেনা মনে হয়েছে রানার–কোথায় দেখেছে, কি পরিস্থিতিতে, কোন্‌ ভূমিকায়, কিছুই মনে করতে পারছে না। তবে ওর মন বলছে, এ লোকের এখানে থাকার প্রশ্নই ওঠে না–এককথায়, অসম্ভব।

অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ লোকটা। যখন দেখেছে তখন

তার এই গোঁফ ছিল না। বেশ একটু মোটাও হয়েছে। বিশ বছর, নাকি পঁচিশ বছর আগে দেখেছে তা-ও রানা স্মরণ করতে পারছে না। তবে মন বলছে এই লোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল ওর। কিন্তু কোথায় তা মনে পড়ছে না।

লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল, রানার নির্ণিমেষ দৃষ্টি অনুভব করতে পেরেছে। এগিয়ে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'কর্নেল ফারুক সৈয়দ। আইএসআই, রিজিওনাল ডিরেক্টর। মাসুদ রানা, বিসিআই, কারেক্ট?'

রানা তার বাড়ানো হাতটা দেখতে না পাবার ভান করে ধরল না। ও এতটাই হতভম্ব হয়ে পড়েছে যে কি করবে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। ভদ্রতা দেখিয়ে শুধু একটু মাথা ঝাঁকাল, ক্ষীণ একটু হাসল, আর নিজেকে সতর্ক করে দেয়ার সুরে মনে মনে বলল, 'খুব বড় কোন ঘাপলা আছে, কাজেই সাবধান, হে!'

ডক্টর এলাহি একনাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছে, কর্নেল ফারুক সৈয়দ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ডক্টর এলাহি, এত গালমন্দ না করে ডক্টর বাদল চৌধুরীকে প্রশ্ন করে জেনে নিলে হয় না ডিজাইনে কিভাবে ভুল হলো? উনি তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

বাদল চৌধুরী ভিড় ঠেলে সামনে বাড়ল, বলল, 'ডক্টর এলাহি, তুমি একটা আস্ত ছোটলোক। একজন বিজ্ঞানী হয়ে এভাবে তুমি আরেকজন বিজ্ঞানীকে গালাগালি করছ?'

'আরে, দোস্তি মে ইসব চলতা হ্যায়!' ডক্টর এলাহি সুর পাল্টে ফেলতে মোটেও সময় নিল না। 'আও ভাই, বৈঠো, চায়ে পিয়ো।'

রানা বুঝতে পারছে, ডাইভার্টার মেশিনের কাজ অল্প একটু বাকি থাকলেও, বাদল চৌধুরীর সাহায্য ছাড়া সেটুকু নিখুঁতভাবে শেষ করতে পারবে না ওরা। পিছনে গালাগালি আর সামনে খাতির করার সেটাই কারণ।

'শোনো, এলাহি,' বাদল চৌধুরী বলল, 'যে-জন্যে আমরা

এসেছি। ডিজাইনে কোন ভুল নেই। আসলে ডিজাইন ঠিক মত ফলো করা হয়নি বলেই মেশিনের কোন কোন অংশ কাজ করছে না। এগুলো ছোটখাট ত্রুটি, ঠিক করতে পাঁচ-সাত ঘণ্টার বেশি লাগবে না। কিন্তু কাজটায় আমি হাত দেবার আগে, মিস্টার মাসুদ রানা কি বলেন সেটা তোমাদেরকে মন দিয়ে শুনতে হবে।'

ডক্টর এলাহি নরম সুরে বলল, 'রানার কথা অবশ্যই আমরা মন দিয়ে শুনব। তবে তার আগে আমার কথা মন দিয়ে শুনতে হবে ওঁকে। কি রাজি তো, মিস্টার রানা, ডিয়ার ব্রাদার?'

আপনা থেকেই চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠল রানার। 'আমি কারও ভাই-টাই নই।'

'এটা আপনি কি কথা বললেন, মিস্টার রানা!' বিস্ময়টা এতই প্রবল, ডক্টর এলাহি যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'আমি মুসলমান আছি, আপনিও মুসলমান আছেন, আর ইসলামের অমর বাণী হলো মুসলমান সবাই আমরা ভাই-ভাই। আপনি নামাজ পড়েন, আমিও নামাজ পড়ি। আপনি হজ করেন, আমিও হজ করি। শত্রুদের ষড়যন্ত্রে আজ আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও এক সময় তো একই জাতি ছিলাম। আমাদের, মুসলমানদের, কমন শত্রু কে? কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বড়ভাই সুলভ আচরণ করছে? কারা মূর্তি পূজার মত গুনাহর কাজ করছে? কারা আমাদের বাজার দখল করে নিচ্ছে?

'মিস্টার রানা, এবার সেই হিন্দুস্থানকে উচিত শাস্তি দেয়ার সময় এসেছে আমাদের। আগেই বলেছি মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই; সব আয়োজন আমাদের, আপনারা শুধু সমর্থন ও সহযোগিতা করুন, ওদের রাজধানীটা আগে মানচিত্র থেকে গায়েব করে দিই...'

'ডক্টর এলাহি, আপনি বিজ্ঞানীদের কলঙ্ক,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'শুধু তাই নয়, আপনি একজন মৌলবাদী ফ্যানাটিক। আপনি মুসলমান কিনা সে-ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে।

আপনার প্রস্তাব শুনে আমার ঘৃণা হচ্ছে।'

মেজর শাকিল ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তখনই বলেছিলাম আমি, যাকে বলি দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার কোন দরকার নেই।'

'তুমি একটু থামো, শাকিল,' বলল কর্নেল ফারুক সৈয়দ। 'মাসুদ রানার যদি কিছু বলার থাকেই, শুনতে অসুবিধে কোথায়? তাছাড়া, বলি বা হত্যা, এ-সব তো আমাদের কাজ নয়।'

'উনি যদি আমাদের দলে যোগ না দেন, আমরা বকদের হাতে তুলে দেব ওঁকে,' ডক্টর এলাহি বলল। 'কেন? কারণ বকদের পবিত্র জঙ্গলে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছেন উনি। বকেরা ওঁকে নিয়ে বলি দেবে, নাকি বিয়ে দেবে, সে তাদের ব্যাপার।' ঠোঁট টিপে হাসল লোকটা, চশমার কিনারা দিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'বলুন, শুনি আপনার কথা।'

'প্রফেসর হাসানের ছেলে বেঁচে আছে কিনা প্রথমে দেখতে চাই আমরা,' বলল রানা। 'তাকে না দেখা পর্যন্ত ডক্টর বাদল চৌধুরী ডাইভার্টার মেশিনে হাত দেবেন না।'

'চৌধুরী আপনাকে বলেনি, তার সাহায্য ছাড়াও মেশিনটা আমরা কমপ্লিট করতে পারব?' হেসে উঠে জানতে চাইল ডক্টর এলাহি।

'হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু আমার ধারণা, আপনারা নিজেরা যদি কাজটা নিখুঁতভাবে করতে পারতেন, ডক্টর চৌধুরীকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখার দরকার বোধ করতেন না। কাজের সময় মেশিনটা বিগড়ে গেলেও চৌধুরীকে আপনাদের দরকার হবে।'

ডক্টর এলাহি হাসল। 'মাসুদ রানা, আপনি দেখছি সত্যি খুব বুদ্ধিমান। তবে একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। প্রফেসর হাসানের ছেলে মরে গেলেই বা কি, বেঁচে থাকলেই বা কি? আপনি কি তাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'হ্যাঁ,' অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল রানা, 'নেহাল আর বাদল

চৌধুরীকে অবশ্যই আমি বের করে নিয়ে যাব এখান থেকে। তাছাড়া, চীনের ওঅরহেড ও মিসাইল হাইজ্যাক করার যে প্ল্যানটা আপনারা করেছেন, সেটাও আমি ব্যর্থ করে দেব।'

মেজর শাকিল হেসে উঠে বলল, 'ডক্টর এলাহি, সার, নেহালকে দেখুক রানা। তাকে দেখলে আন্দাজ করতে পারবে নিজের কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে।'

'বলছ?' ডক্টর এলাহির ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চোখে-মুখে কৌতুক ফুটে উঠল।

'জ্বী, সার!'

'তবে সাবধান কিন্তু!' কর্নেল ফারুক সৈয়দ বলল। 'মাসুদ রানাকে ছোট করে দেখো না। ওর কতটুকু গুরুত্ব তোমরা জানো না, আমি জানি। কাজেই আমার নির্দেশ ছাড়া ওকে যেন খুন করা না হয়।'

রানার কেন যেন সন্দেহ হলো, কর্নেল ওকে ঘুষ দিতে চাইছে। ও চিনে ফেললে লোকটার অসুবিধে হবে?

'মেজর এহসান!' গম্ভীর সুরে উচ্চারণ করল ডক্টর এলাহি।

দম দেয়া পুতুলের মত রানাকে পাশ কাটিয়ে দু'পা সামনে বাড়ল মেজর এহসান। ইঙ্গিতে ওদের উল্টোদিকের দেয়ালটা তাকে দেখিয়ে দিল ডক্টর এলাহি। পাথরের কোন্ খাঁজের ভেতর লুকানো বোতাম আছে, এহসান জানে। সেটায় চাপ দিতেই বড় একটা প্যানেল হড়কে সরে গেল একপাশে, সেই সঙ্গে উন্মুক্ত হলো আট বর্গ ফুটী একটা জানালা। ইঙ্গিতে সেদিকে ওদেরকে ডাকল ডক্টর এলাহি।

রানা লক্ষ করল, কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কর্নেল ফারুক, মাথাটা, চিন্তার ভারেই বোধহয়, নুয়ে আছে।

জানালা দিয়ে নিচের একটা ঘরে তাকাল ওরা। দশ বারোজন বিবস্ত্র বক আদিবাসী সেই ঘরের মেঝেতে ঘুরে ঘুরে নাচছে। বিবস্ত্র হলেও তাদের শরীরে সোনার অলংকারের কোন অভাব

নেই, অভাব নেই বহুরঙে আঁকা নকশারও। ঘরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের তৈরি একটা বেদি দেখা যাচ্ছে, সেটাকে ঘিরেই নাচছে তারা। বেদিতে শুয়ে রয়েছে এক কিশোর ছেলে। তার হাত ও পা বেদিতে গাঁথা লোহার আঙটার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখটা অন্য দিকে ফেরানো, তাই দেখা যাচ্ছে না। তবে ছেলেটা যে নেহাল, তা বুঝতে পারল রানা।

আদিবাসী বকেরা নাচতে নাচতে গানও গাইছে, তবে জানালায় কাঁচ থাকায় ওরা কোন শব্দ পাচ্ছে না।

কখন ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বলতে পারবে না রানা, ওর ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস ফেলে ডক্টর এলাহি বলল, 'চৌধুরী বলছে, ত্রুটিগুলো সারাতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে তার। কিন্তু আমি তাকে মাত্র তিন ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করলাম, মিস্টার রানা। কাউন্ট ডাউন এই মুহূর্ত থেকে শুরু হলো। তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ত্রুটি না সারানো হলে প্রফেসর হাসানের ওই ছেলেকে বকেরা নিয়ে যাবে। কোথায়, কি করতে, তা আশা করি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।

'এবার, মিস্টার রানা, আপনার প্রসঙ্গ। আপনার হয়তো জানা নেই, বকেদের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তির একটা শর্ত রক্ষা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমরা। মেজর শাকিল আর মিস নাসরিন চেয়েছিল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু দুঃখিত, মিস্টার রানা—বকদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে বিপদে পড়ে যাব আমরা। কাজেই বলতে পারেন এক রকম অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের হাতে আপনাকে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছি। মেজর এহসান!'

'কিন্তু কর্নেল ফারুক যে বললেন তাঁর অনুমতি ছাড়া...'

রানার কথা শেষ হলো না, ডক্টর এলাহি বলল, 'উনি আইএসআই কর্মকর্তা হলেও, কিছু ব্যাপারে ওনার চেয়ে বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাকে, ব্রাদার!'

এগিয়ে এসে রানার পাঁজরে আবার পিস্তলের খোঁচা মারল মেজর এহসান, তারপর চোখ ইশারায় একজন সৈনিককে ডেকে নিল।

রাইফেলের গুঁতো খেয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা। জানে খুন করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ বাঁচার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

ধাপ বেয়ে নামছে ওরা। কারখানা তথা ল্যাবরেটরির কোন শব্দ এদিকে আসছে না দু'ধারের দেয়াল দুটোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। বর্মীরা একটু খাটো বলেই বোধহয় মশাল আটকাবার হোল্ডারগুলো বেশি উঁচুতে তৈরি করা হয়নি, রানা তাদের চেয়ে লম্বা হওয়ায় আরও সহজে ওগুলোর নাগাল পাবে। দম বন্ধ করল ও, পিছন থেকে আসা লোক দু'জনের পায়ের আওয়াজ শুনে দূরত্ব আন্দাজ করছে।

অ্যাকশন শুরু করল রানা বিদ্যুৎবেগে। এক লাফে পার হলো তিনটে ধাপ, নামার সময় হাতে চলে এলো জ্বলন্ত একটা মশালের গোড়া। মেজর এহসান ও সৈনিক, দু'জনের গলা থেকেই আঁতকে ওঠার আওয়াজ বেরুল। এরই মধ্যে ঘুরে গেছে রানা, মশালের জ্বলন্ত ডগা দিয়ে গুঁতো মারল তাদের মুখ আর বুক লক্ষ করে। পোড়া গোঁফের গন্ধ এলো রানার নাকে।

দু'জনেই ওরা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, তবে হাতের অস্ত্র তুলে গুলি করতে যাচ্ছে। মশালটা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই পিছন দিকে ঝাঁপ দিল রানা, করিডরে পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটা। তারপর এক লাফে সিধে হয়ে ছুটল। ছুটছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে জানে না। শুনতে পেল ধুপধাপ পা ফেলে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে আসছে মেজর এহসান আর রাইফেলধারী সৈনিক।

ছয়

প্রথম যে বাঁকটা পাওয়া গেল সেটা ঘুরে নতুন একটা প্যাসেজে ঢুকে পড়ল রানা। পিছনে মেজর এহসান আর সৈনিকটা তো আছেই, করিডরের দরজা দিয়ে আরও কিছু সৈনিক বেরিয়ে আসছে। তারা একটু বুদ্ধি খাটালে রানাকে সহজেই ফাঁদে আটকে ফেলতে পারবে।

প্যাসেজটার প্রথম বারো গজের মধ্যে দুটো মশাল রয়েছে, তারপর একটাও নেই। এই প্যাসেজ বা টানেল আগেরগুলোর চেয়ে সরু, এঁকেবেঁকে নিচের দিকে নেমে গেছে। শব্দ শুনে মনে হলো না পিছু নিয়ে কেউ আসছে। তবে রানা জানে পাথরের দেয়ালে বাধা পেলে শব্দ বেশি দূর যেতে পারে না।

আঁকাবাঁকা পথ, কত দূর এলো বোঝা যায় না। একসময় আলোর আভাস দেখা গেল, এখনও পিছন থেকে কোন শব্দ পাচ্ছে না রানা। দশ ফুট সামনে প্যাসেজটা বাম দিকে ঘুরে গেছে, সেদিক থেকে আসা আলো নাচানাচি করছে দেয়ালে। মসৃণ পাথরে পিঠ ঘষে এগোল রানা, বাঁকের কাছে পৌঁছে সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল।

করিডরের শেষ মাথায় একটা কামরা। এই কামরা আগেও দেখেছে রানা। এটা হলো বকেদের বলি দেয়ার পবিত্র স্থান। এই ঘরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের একটা বেদি আছে, সেই বেদিতে শুইয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে কিশোর নেহালকে।

নৃত্যরত বকেরা চলে গেছে। কামরার চৌকাঠ থেকে ভেতরে তাকাল রানা, ছায়াগুলোর ভেতর কেউ আছে কিনা দেখছে। না, নেহাল একা। ভেতরে পা দিল রানা, তাকিয়ে আছে ওপর দিকের দেয়ালে, ডক্টর এলাহির নির্দেশে মেজর এহসান যেখানটায় প্যানেল খুলেছিল। দেয়ালটা সম্পূর্ণ অন্ধকার, জানালা বা জানালার কাঁচ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝুঁকি থাকলে থাকল, গ্রাহ্য না করে শ্বেতপাথরের বেদির পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ওর পায়ের শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেটা। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না, ভাবল স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু যেই রানা বাঁধন খোলার জন্যে স্পর্শ করল, অমনি আবেগে বেসুরো হয়ে ওঠা গলায় বলল, 'আপনি কি সত্যি? সত্যি আমার মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে জবাব দিল রানা, রশির গিঁট খুলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ঢোকার সময়ই দেখেছে, কামরাটা থেকে তিনটে পথ দিয়ে বেরুনো যায়। 'আদিবাসীরা কোন্ দিক দিয়ে গেল?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও।

চোখ ইশারায় সরাসরি সামনের একটা দরজা দেখাল নেহাল। 'ওদিক দিয়ে।' রানা তৃতীয় দরজার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মাথা নাড়ল সে। 'ওদিক দিয়ে ওপরের কারখানায় যাওয়া যায়।'

সন্দেহ নেই আইএসআই অফিসাররা এতক্ষণে মন্দিরের সব ক'জন গার্ডকে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু তারা কি নিশ্চিতভাবে জানে যে রানা কোন্ প্যাসেজ ধরে কোন্দিকে গেছে? নাকি ধীরে-সুস্থে প্রতিটি টানেল সার্চ করছে তারা? রানার মনে হলো, আদিবাসীদের পথে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ। পিস্তল ও রাইফেলের হাত থেকে বাঁচার চেয়ে তীর ও বর্শার হাত থেকে বাঁচা অনেক সহজ। 'তুমি হাঁটতে পারবে তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেদি থেকে নিজের চেষ্টাতেই নামল নেহাল। রক্ত চলাচল ঠিকমত শুরু করানোর জন্যে হাত-পা একটু রগড়ে নিল সে। তারপর বলল, 'চলুন, মাসুদ ভাই।'

আদিবাসীদের পথ অনুসরণ করছে ওরা। খানিকদূর যেতেই একটা আলো মিটমিট করতে দেখল রানা। দাঁড়িয়ে কান পাতল। কানে কোন শব্দই আসছে না। এমনও হতে পারে যে এক পাল ব্লাডহাউন্ড কুকুর নিয়ে খোঁজা হচ্ছে ওকে, অথচ কি হচ্ছে ওর কোন ধারণাই নেই।

এই নিস্তব্ধতা ভৌতিক। পা টিপে টিপে হাঁটছে রানা। বলে দিতে হয়নি, দেখাদেখি নেহালও। শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার অভিজ্ঞতা কিছুটা তো তার আছেই। আরেকটা বাঁকের কাছে পৌঁছাল ওরা। প্রায় ধাক্কাই খেলো নেহাল বক লোকটার সঙ্গে। সে-ও কাউকে দেখতে পায়নি, তবে এক সেকেন্ড আগে নিশ্চয়ই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। ছুরির বাঁটে একটা হাত ছিলই, সড়াৎ করে টেনে বের করল সেটা খাপ থেকে। আচমকা ক্ষিপ্রগতিতে হামলাটা হলো। এক টানে নেহালকে পিছনে সরিয়ে নেয়ায় লোকটার চালিয়ে দেয়া ছুরিটা উঠে গেল ওপর দিকে। এক পা এগিয়ে আবার মারতে যাবে, এমনি সময়ে ঝাঁপ দিল রানা। উড়ে গিয়ে লোকটার বুকের খাঁচায় গুঁতো মারল মাথা দিয়ে, পরমুহূর্তে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। বকের দুই হাতই আটকা পড়েছে। শরীর মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে, আবার তুলতে চাইছে ছুরিটা। নিজের শক্তি ও সাহসের ওপর এতই বিশ্বাস, সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে রাজি নয়।

ঠেলে নিয়ে এলো ওকে রানা দেয়ালের ধারে, পরমুহূর্তে সব শক্তি এক করে বুকে দু'হাত রেখে ধাক্কা দিল। ঠাস করে এত জোরে আওয়াজ হলো, রানার মনে হলো এখুনি বুঝি খুলি ফেটে মগজের ছিটে লাগবে ওর মুখে। বকের চোখ থেকে খুনের নেশা দূর হয়ে গেল; ঘোলাটে, নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে এখন। তার পরেও ছুরি ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলছে আবার। দয়া মায়া না করে প্রচণ্ড এক লাথি মারল রানা তার ঊরুসন্ধিতে। কুঁজো হয়ে গোঙাচ্ছে, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে চিবুকে আঘাত করল রানা, প্রায়

একই সঙ্গে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল ঘাড়ে। মুখ থুবড়ে পড়ার পর লোকটা আর নড়ল না। ছুরিটা তুলে নিয়ে নেহালের একটা হাত ধরে ছুটল রানা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মূল করিডরে চলে এলো ওরা, যে করিডর ধরে ডক্টরদের কারখানা, অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে যাওয়া যায়।

এখন পর্যন্ত কোন সৈনিক বা গার্ড দেখা যায়নি, তবে রানা নিশ্চিত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হন্যে হয়ে খুঁজছে তারা ওকে। নির্দিষ্ট কিছু জায়গা তো অবশ্যই সার্চ করতে বলা হয়েছে, এবং এক সময় তাদের সামনে পড়তেই হবে ওকে।

'মন্দিরের ভেতর কোথায় কি আছে তুমি জানো?' ছুটতে ছুটতেই নেহালকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিশেষ করে কোন প্যাসেজ কোন দিকে গেছে বলতে পারবে?'

'কয়েকটা ছোট কামরা আছে, তারই একটায় আমাকে আটকে রেখে ছিল...' কথা শেষ না করে মাথা নাড়ল নেহাল। রানাকে কোন রকম সাহায্য করতে না পারায় চেহারা কালো হয়ে উঠল।

হাত তুলে দেখাল রানা। 'কারখানাটা ওদিকে—ওপরে।'

'আমাকে তাহলে ওদিকে রাখা হয়েছিল,' বলে উল্টোদিকের একটা প্যাসেজ দেখাল নেহাল।

বেরুবার পথ নেই, এমন কোন প্যাসেজে ঢুকতে চাইছে না রানা। প্রধান করিডর ধরেই নেহালকে নিয়ে ছুটছে। পাশের একটা প্যাসেজে মশালের শিখা কাঁপতে দেখে শিউরে উঠল নেহাল, তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে অভয় দিল রানা।

প্রথম দর্শনে বড় কামরাটাকে একদম খালি দেখাল। বাদল চৌধুরীর সঙ্গে ডক্টর এলাহির ল্যাবে যাবার সময় এখানে গার্ড দেখেছিল রানা। তারা ধরে নিয়েছে এদিকে ওর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, তাই অন্যান্য প্যাসেজে বেশি মনোযোগ দিয়েছে।

প্রবেশপথের মুখে গুড়ি মেরে অপেক্ষা করছে রানা, গাঢ়

ছায়ার ভেতর কিছু নড়ে কিনা দেখতে চায়।

পাথরের একটা থামের পিছনে অস্পষ্ট নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখের কোণে। তবে রানা নিশ্চিত নয়, চোখের ভুলও হতে পারে। কোমরের বিছে শব্দ করায় বোঝা গেল লোকটা বক। আরও একটু ধৈর্যের পরিচয় দিল রানা। মশালের আলো সরাসরি থামটা পর্যন্ত পৌঁছায়নি, তবে তার আভায় লোকটার গলার অলঙ্কার আর মুখে মাখা উজ্জ্বল রঙ মাঝেমধ্যে দেখা গেল। হাতে একটা বর্শা, ফলাটা চকচক করছে।

'ওর সঙ্গে লড়তে হবে,' নেহালকে পিছনদিকে ঠেলে দিয়ে ফিসফিস করল রানা। 'আমি সংকেত না দিলে তুমি কোথাও যাবে না।'

'ইয়েস, সার!' চাপা গলায় বলল নেহাল।

শরীরটা প্রায় দু'ভাঁজ করে কামরার ভেতর ঢুকল রানা, দেয়াল ঘেঁষে এগোল, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। বোঝার কোন উপায় নেই রানাকে সে দেখতে পেয়েছে কিনা। ও এগোচ্ছে, কিন্তু লোকটা এক চুলও নড়ছে না।

পরমুহূর্তে বোঝা গেল, শিকারকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্যেই লোকটা শান্ত ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছিল। আলোর ক্ষীণ একটু আভা জায়গা বদল করল, লোকটা বর্শা তুলে ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হবার সময়। ছুটল রানা, দশফুট দূরত্ব আঁকাবাঁকা একটা পথ তৈরি করে পেরুচ্ছে। পজিশন বদলে বর্শা ছুঁড়ল বক। নিঃশব্দে রানার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল সেটা, চুল ছুঁয়ে। শব্দ শুনে বোঝা গেল রানার পিছনের পাথরে পড়েছে অস্ত্রটা। লোকটা এগিয়ে এসেছিল, রানার ছোটাও বন্ধ হয়নি। পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষই হলো। রানা পিছু হটতে দেখা গেল ওর হাতের ছুরির ফলা লোকটার বাম বুকের ভেতর হারিয়ে গেছে, বেরিয়ে আছে শুধু হাতলটা। ভারী বস্তার মত আছাড় খেলো সে। ছুরিটা টান দিয়ে বের করল রানা, লোকটার কোমরবন্ধে ঘষে

ফলার রক্ত মুছল, তারপর সিধে হয়ে মরা বকের বর্শাটা হাতে তুলে নেয়ার সংকেত দিল নেহালকে।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামছে ওরা। বাইরে বেরুতে পারলে রানার প্রথম কাজ হবে কাসিমকে খুঁজে বের করা, নিজেদের শক্তি বাড়ানো। এ পর্যন্ত ভাগ্য বড় বেশি সাহায্য করেছে, আর বেশি কিছু আশা করা উচিত হবে না। ও একা, ওরা অসংখ্য। ভাগ্য যে-কোন মুহূর্তে ঘুরে যেতে পারে।

প্যাসেজের মেঝে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। যথাসম্ভব কম শব্দ করে যত দ্রুত পারা যায় ছুটছে ওরা। পাশ কাটাবার সময় দু'পাশের প্রতিটি প্যাসেজে চোখ বুলাচ্ছে রানা। ভাগ্য এখনও প্রসন্ন, কোন সৈনিক বা বকের সামনে পড়তে হচ্ছে না। অবশেষে দিনের ম্লান আলো দেখতে পেল ওরা—গোধূলি, একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক।

মন্দিরের বাইরে বাতাস এখন ঠাণ্ডা, দম নেয়ার সময় ফাঁকা জায়গাটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। গাছের ডালে আদিবাসী বক, এমন কি পাকিস্তানী সৈনিকও থাকতে পারে, তবে রানার চোখে ধরা পড়ল না। মন্দিরের আশপাশে বনভূমি নিস্তব্ধ হয়ে আছে। সাবধানের মার নেই ভেবে মন্দিরের দেয়াল ঘেঁষে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল রানা, অন্তত কাসিমকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত। নেহালের হাত ধরে আবার ছুটল ও।

দোরগোড়া থেকে তিন ফুটও এগোতে পারেনি, খসখসে একটা আওয়াজ শুনে ওপর দিকে তাকাতেই রানা দেখতে পেল বিশাল একটা জাল ঢেকে ফেলছে ওদেরকে। রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, নেহালকে নিয়ে জালের বাইরে সরে যাবে। কিন্তু ভারী বোঝার মত ওদের গায়ে-মাথায় এসে পড়ল জালটা, হাত-পাও জড়িয়ে যাচ্ছে তাতে। রানার সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ল নেহালও, শরীর গড়িয়ে দিল, আহত খরগোসের মত চিৎকার করছে, দু'হাতে ধরে টেনে ছেঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে মোটা জাল।

মন্দিরের প্রবেশপথের মাথায় চওড়া কার্নিসে বসে ছিল, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল দু'জন আদিবাসী বক, কর্ড ধরে টান দিয়ে বন্ধ করে দিল জালের মুখ, ভেতরে আটকা পড়ল রানা ও নেহাল। জালটাকে টেনে-টুনে ছোট করে আনল তারা, ফলে যে-কোন দিকে মাত্র দু'এক ইঞ্চির বেশি নড়াচড়া করার উপায় থাকল না ওদের। দোরগোড়ায় আরেকজন গার্ডকে দেখা গেল। তিনজন মিলে বান্ডিলটা টেনে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে।

প্যাসেজের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বকেরা, বান্ডিলের ভেতর নেহালের সঙ্গে কথা বলছে রানা। 'মন্দিরের ভেতর কে কোথায় থাকে, খেয়াল করেছ? গার্ডরা কোথায় ঘুমায়, সব মিলিয়ে ওরা কতজন, নাসরিন নামে মেয়েটা কোথায় শোয়, এই সব?'

'যে কামরায় লোকটাকে আপনি মারলেন, ওটা থেকে কয়েকটা প্যাসেজ বেরিয়েছে, প্রতিটি প্যাসেজের দু'পাশে কামরা আছে, সৈন্যরা সম্ভবত ওগুলোতেই ঘুমায়।'

'বাকি সবাই?'

'বিজ্ঞানীরা থাকেন ওপরতলায়, কারখানার কাছাকাছি। ওখানে কর্নেল ফারুক সৈয়দের একটা কামরা আছে। কিন্তু ওই মেয়েটি বা মেজররা কোথায় থাকে বলতে পারব না। আর বকেরা থাকে মন্দিরের বাইরে। জঙ্গলে কোথাও বোধহয় কুঁড়েঘর আছে ওদের।'

রানা যেখানে বকের লাশ ফেলে গেছে, সেই বড় কামরাটায় পৌঁছল বান্ডিলটা। ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো আরও দু'জন গার্ড, তারা রানা ও নেহালের দিকে বর্শা তাক করে দাঁড়াল; বাকি তিনজন জাল থেকে ওদেরকে বের করে দাঁড় করাল। একজন কি একটা নির্দেশ দিতে নেহালকে নিয়ে চলে গেল দু'জন বক-গার্ড। একজন বক রানার হাত দুটো রশি দিয়ে বাঁধছে, বাকি তিনজন নিজেদের ভাষায় কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে। ভাব দেখে মনে হলো, তাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দেয়া হলেও, পরিস্থিতির কারণে কয়েকটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। হাত-মুখ নেড়ে,

ভুরু কুঁচকে, নিচু গলায় তর্ক-বিতর্ক করছে। এই সময় কারখানার দিক থেকে কামরায় এসে ঢুকল মেজর এহ্সান, হাতের পিস্তলটায় সাইলেন্সার ফিট করা। গায়ের শার্ট অনেকটাই পুড়ে গেছে, রানার খোঁজে এত ব্যস্ত ছিল যে সেটা বদলাবারও সময় পায়নি। আদিবাসীদের ভাষায় কিছু বলল সে। তিন বকের লীডার পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে কড়া ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল এহ্সান। চোখে ঘৃণা ও আক্রোশ নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, নির্দেশটা আরেকবার উচ্চারণ করল। বকেরা রানাকে টেনে নিয়ে চলল। পিছু নিয়ে এহ্সানও আসছে।

রানাকে অবাক করে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হলো ওকে, তারপর প্যাসেজ ধরে বের করা হলো মন্দিরের বাইরে। পিছন থেকে বর্শার খোঁচা খেয়ে হাঁটার গতি বাড়াতে বাধ্য হলো রানা। এহ্সান এখন সামনে, হন-হন করে এগোচ্ছে।

পথটা সরলরেখার মত, এক সময় যথেষ্ট চওড়া ছিল, তবে আগাছা জন্মানোয় সরু হয়ে গেছে। কাসিমকে যেখানে রেখে গিয়েছিল রানা সেখান থেকে তাকালে মন্দিরের উল্টোদিকে পৌঁছাচ্ছে দলটা। কাসিম কি দেখতে পাচ্ছে?—ভাবল রানা। নাকি তাকেও বন্দী করেছে বকেরা?

আরও একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। না, এটাকে ঠিক ফাঁকা জায়গা বলা চলে না। গোলাকার একটা বিশ-পঁচিশ ফুট ব্যাসের গহ্বর দেখতে পেল রানা সামনে। মানুষের তৈরি ইঁদারা নয় – প্রাকৃতিক, কিন্তু ঠিক ইঁদারার মতই প্রায়-খাড়া নেমে গেছে দেয়াল। গহ্বরের কিনারা পাথর গেঁথে দু'ফুটের মত উঁচু করে ঘেরা হয়েছে। গহ্বরের প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে দোয়াতের কালির মত কালো পানি। গহ্বরের দেয়ালটা অবশ্য খড়িমাটির মত সাদা। মাটির নিচে এ হলো লাইমস্টোন। রানা বুঝে নিল, এই গহ্বর বা গভীর ইঁদারা আদিবাসীদের অত্যন্ত পবিত্র স্থান—এখানেই তারা দেবতার ভোগ, অর্থাৎ নরবলি দেয়।

নিশ্চয়ই ওই কালো পানিতে রানাকে ফেলে দেয়ার প্ল্যান করছে ওরা। বকেদের সঙ্গে কি নিয়ে এহসানের তর্ক হচ্ছে, রানা আন্দাজ করতে পারছে না।

পকেট থেকে নাইলনের কয়েক প্রস্থ কর্ড বের করল এহসান, গার্ডদের নির্দেশ দিয়ে বলল রানার হাত-পা খুব শক্ত করে বাঁধতে হবে। রানার দিকে চেয়ে এক টুকরো শয়তানী হাসি হেসে বলল, 'এবার আর তুমি পালাতে পারবে না, মাসুদ রানা।'

'একটা গুলি করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলছ না কেন?'

এহসানের হাসিটা তিক্ত ও কর্কশ। 'একটু গোলমাল বা চালাকি করে দেখো গুলি করি কিনা। আমাদের সমস্যা হলো, বকদেরকে হাতে রাখতে হচ্ছে। ওরা গোলাগুলি একদমই পছন্দ করে না। শত্রুকে দেবতা বাঘের ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারলে আর কিছু চায় না ওরা।' বাঘ কচি মাংস পছন্দ করে, তাই সময় মত নেহালকে তার ভোগ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তোমাকে ওরা এখুনি জলদেবতার উদ্দেশে বলি দিতে রাজি নয়, কারণ ওদের ধারণা তুমি অপবিত্র।' ইঙ্গিতে গহ্বরের পানিটা দেখাল সে। 'ওখানে পড়ার পর আজ পর্যন্ত কেউ উঠে আসেনি। তবে তোমার কথা আলাদা। শুনেছি তোমার পক্ষে নাকি সবই সম্ভব—কে জানে হয়তো উড়তেও পার! তাই এই ইঁদারার কিনারায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমি। যদি দেখি তুমি উঠে আসছ—তাহলে গুলি না করে আর উপায় থাকবে না আমার!' বকদের দিকে ফিরে ইশারা করল সে।

রানাকে ধরে টেনে এনে ইঁদারার কিনারায় দাঁড় করানো হলো। পঞ্চাশ ফুট নিচে পানি। এত কালো, তলাটা দেখা যাচ্ছে না। এ-ধরনের জলাধার সম্পর্কে শুনেছে রানা। কোন-কোনটা কয়েকশো ফুট পর্যন্ত গভীর হয়। লাইমস্টোনের ফাটল থেকে কিছু শিকড় বেরিয়েছে, শিকড় বা ঝুরি—গাছ-পালার জটা—ইঁদারার দেয়াল বেয়ে নেমে গেছে, ঝুলছে পানির ওপর। রানা যদি

ওগুলোর একটা ধরতে পারে...

আচমকা পিঠে প্রচণ্ড এক ধাক্কা। রানা দেখল, খসে পড়ছে ও। সবেগে উঠে এলো ইঁদারার কালো পানি, ঝপাৎ করে নিতম্ব দিয়ে পড়ল ও ঠাণ্ডা পানিতে, পড়েই তলিয়ে গেল বিশ ফুট গভীরে।

কোনমতে বাঁধা হাত-পা নেড়ে ভেসে ওঠার সময় হঠাৎ একটা ভয় গ্রাস করল রানাকে–মেজর এহসান বলেছে, জলদেবতার উদ্দেশে ওকে বলি দেয়া হচ্ছে–জলদেবতা মানে কুমির নয়তো? এই পানিতে আছেন তেনারা? পানির ওপর মাথা তুলে দম নেয়ার সময় চারদিকে তাকাল রানা, কুমির আসছে কিনা দেখছে। তবে না, পানিতে বাড়তি কোন আলোড়ন এখনও ওর চোখে পড়ছে না। ওপর দিকে তাকাল, দু'সেকেন্ডের মাথায় খুঁজে পেল এহসানকে। বদ্ধ জায়গায় কানে তালা লাগানো প্রচণ্ড আওয়াজ করছে পিস্তল, বুলেটগুলো ওর চারপাশের পানিতে এসে পড়ছে। এহসানের সরাসরি নিচে মোটা একটা ঝুরিকে টার্গেট করল রানা, পানির নিচে ডুব দিয়ে জোড়া পায়ে যত দ্রুত সম্ভব সাঁতরাচ্ছে। ইঁদারার দেয়াল নাগালের মধ্যে চলে এলো। টের পাচ্ছে, এখনও গুলি করছে এহসান। তবে একটা বুলেটও রানার দু'ফুটের মধ্যে পড়ছে না। এটা আসলে এহসানের একটা খেলা। জানে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এমনিতেই বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে পারবে না রানা, কিন্তু কিছুতেই ওকে পানির ওপর মাথা তুলতে দিতে চায় না, যাতে শীঘ্রিই ডুবে মারা যায় ও।

লাইমস্টোনের দেয়াল ধরে পানির নিচ থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে রানা। পানির ওপর মাথা না তুলে, প্রথমে শুধু নাকটা তুলল। চোখ থেকে পানি সরে যাবার পর ওপর দিকে তাকাল, কিন্তু এহসানকে দেখতে পেল না। ওর চোখের সরাসরি ওপরে ছোট্ট একটা কার্নিস দেখা যাচ্ছে, দৃষ্টি পথে ওটা বাধা হয়ে থাকায় মেজরকে দেখতে পাচ্ছে না ও। ইঁদারার কিনারায় মশাল

জ্বলছে, সেই মশালের আলো পড়েছে নিচের কালো পানিতে, আলোর সঙ্গে এহসানের ছায়াও পড়েছে।

বাকি গার্ডদেরও রানা দেখতে পাচ্ছে না, তবে তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এহসানের হাত নাড়াটা লক্ষ করল রানা, ইঙ্গিতে গোটা ইঁদারাটা গার্ডদের দেখিয়ে কি যেন বলল সে। বকেরা চুপ করে গেল।

সময় বইছে ধীরে ধীরে। এক সময় ইঁদারার পানি আয়নার মত স্থির হয়ে গেল। কর্কশ গলায় আবার কি যেন বলল এহসান। সে সম্ভবত অভিযোগ করছে–কোথায় তোমাদের জলদেবতা? জলদেবতা ভোগ গ্রহণ করতে এলে পানিতে আলোড়ন উঠত না? রানার রক্তে লাল হত না পানি?

একটু পর অবশ্য হাসতেও দেখা গেল তাকে। তার উল্লাসধ্বনি পরিষ্কারই শুনতে পেল রানা, 'নদী-নালার দেশে জন্ম হলে কি হবে, শালা বঙ্গালী ডুবেই মারা গেছে।'

ইঁদারার পানি আশ্চর্য ঠাণ্ডা, সম্ভবত গভীর পাতালের কোন ঝর্ণাধারা থেকে আসছে। এক চুল নড়ছে না রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এহসানের ছায়ার দিকে।

ঝাড়া দশ মিনিট এহসানও এক চুল নড়ল না। লোকটার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। এবার সে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। তবে একসময় তাকে ধরে নিতে হলো যে সত্যিই রানা ডুবে মারা গেছে। ফিরে গেল সে, অন্তত তার ছায়াটা সরে গেল পানি থেকে।

সত্যি ফিরে গেছে এহসান? রানাও কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। আরও দশ মিনিট সামান্যতমও নড়ল না ও। তারপর দেয়াল ধরে ধরে ইঁদারার পরিধি ঘুরে এলো একপাক। উদ্ধার পাওয়ার উপায় খুঁজছে। দেয়ালগুলো খাড়া, দু'একটা তাক বা কার্নিস থাকলেও পা রাখার মত এমন কোন গর্ত নেই যে পঞ্চাশ ফুট ওপরে ওঠা যাবে। তাছাড়া, থাকলেও লাভ হত না, রানার হাত-

পা নাইলনের রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

দেয়ালের কাছে ফিরে এসে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একটা ঝুরি ধরল রানা, তারপর হাতের বাঁধনটা খোলার চেষ্টা করল। যে লোকটা বেঁধেছে সে তার কাজ বোঝে। দাঁত দিয়ে গিঁট খোলার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। লাইমস্টোনের গা থেকে বেরিয়ে আসা চোখা একটা পাথরে নাইলন কর্ড ঘষল। কিন্তু পাথর গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল, কর্ডের কিছুই হলো না।

সবশেষে একটা মোটা ঝুরিকে টার্গেট করল রানা। একমাত্র ওটাই ইঁদারার মাথার কাছাকাছি থেকে নেমে এসেছে। হোক হাত-পা বাঁধা, ওটা ধরে উঠতে চেষ্টা করবে রানা। বাঁচার এটাই একমাত্র পথ।

দেখার আগে ছায়াটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারল রানা। ইঁদারার অন্যদিকের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। বড় করে শ্বাস নিল রানা ডুব দেয়ার জন্যে, প্রার্থনা করছে ডুব দেয়ার আগেই যাতে এহসানের বুলেট ছুটে না আসে।

সাত

পানির নিচে অর্ধেকটা ডুবে গেছে, এই সময় উপলব্ধি করল রানা লোকটা ওর উদ্দেশে হাত নাড়ছে, তার হাতে কোন পিস্তলও নেই। শুধু তাই নয়, মূর্তিটা কেমন যেন চেনা চেনাও বটে। পানির ওপর মাথা তুলল ও, চোখ থেকে পানি সরাল, তারপর আবার তাকাল মুখ তুলে।

লোকটা ওর গাইড। কাসিম গাওয়া। এই পরিস্থিতিতে আর কাউকে দেখলে এতটা খুশি হতে পারত না ও; সাহায্য পাবার চিন্তাটা এলো পরবর্তী মুহূর্তে, প্রথম মুহূর্ত ওকে স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত করে তুলল বিশ্বস্ততার মাধ্যমে প্রিয় হয়ে ওঠা মানুষটা বেঁচে আছে দেখে।

ইঙ্গিতে ইঁদারার এক ধারে যেতে বলছে কাসিম, যেদিকে কুণ্ডলী খুলে রশি ফেলছে সে–রশির এই কয়েল ন্যাপস্যাকে ভরে ওরাই নিয়ে এসেছে।

সাঁতরে রশির কাছে চলে এলো রানা। প্রান্তটা কোমরে জড়িয়ে গিঁট দিল। ওপর থেকে টেনে ওকে তুলে নিচ্ছে কাসিম। কাজটা সহজ হলো না, তবে লাইমস্টোনের খাঁজে আর ছোটখাট গর্তে পা রেখে রানাও সাহায্য করল ওকে, নিজের ওজন যতটা সম্ভব কমিয়ে। ইঁদারার কিনারায় ওঠার পর দেখল, রশির অপর প্রান্তটা সরু একটা সুপারি গাছে এক পাক জড়িয়ে নিয়েছে কাসিম, ফলে ওর ওজনের বেশিরভাগটাই বহন করেছে ওই গাছ।

ছুটে এলো কাসিম, ছুরি দিয়ে দ্রুত কেটে দিল রশির বাঁধনগুলো। সেগুলো কুড়িয়ে ইঁদারায় ফেলে দিল রানা। 'ধন্যবাদ, কাসিম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'উঁকি দিয়ে না তাকালে আমাকে তুমি দেখতেই পেতে না।'

'আপনাকে যখন ফেলে দিল তখনই তো দেখেছি,' বলল কাসিম। 'আবার ফিরে আসে কিনা এই ভয়ে এতটা দেরি করলাম। পথের ওপর দাঁড়িয়ে বকেরা তর্ক করছিল–আপনাকে পবিত্র করা হয়নি, কাজেই দেবতারা আপনাকে আদৌ গ্রহণ করে কিনা।'

দাঁড়াল রানা। 'ওরা সবাই আবার মন্দিরের ভেতর ঢুকেছে?'

মাথা ঝাঁকাল কাসিম। 'ওরা জানে না আমি বেঁচে আছি। যেখানে হামলা হয়েছিল, ওই জায়গায় মিছিমিছি একটা কবর বানিয়েছি–যেন আমি মারা যাওয়ায় আপনি আমাকে মাটি

দিয়েছেন। কবরের পাশে একটা পাথরও খাড়া করা আছে, তাতে আমার নাম খোদাই করা। ভাল করে পরীক্ষা না করলে অন্তত কিছুদিন ওদেরকে বোকা বানিয়ে রাখবে ওই কবর।'

'মন্দ নয়,' বলল রানা। 'এখন তো আমিও বেঁচে নেই।'

'জ্বী। এতে বোধহয় খানিকটা সুবিধে পাব আমরা।' বত্রিশপাটি দাঁত বের করল কাসিম গাওয়া।

পরমুহূর্তে রানার কথা শুনে প্রায় চমকে উঠল সে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে তো প্রচুর বিস্ফোরক আনতে বলা হয়েছিল। সেগুলো কোথায়?'

'আমাকে...কি? কি বলছেন, সার? না তো!'

'শিউলি তোমাকে এ-বিষয়ে কিছুই বলেনি?' রানা গম্ভীর।

মাথা চুলকাল কাসিম। 'একটু থামুন। হ্যাঁ, বলেছিলেন। কিন্তু আমি ধরে নিই নিশ্চয়ই উনি ঠাট্টা করছেন। আর্কিওলজিকাল সাইট দেখতে গেলে কে কবে জেলিগনাইটের মত বিপজ্জনক বিস্ফোরক সঙ্গে নেয়, বলুন!'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা।

খানিক ইতস্তত করে কাসিম জিজ্ঞেস করল, 'বিস্ফোরক দিয়ে কি করবেন, সার?'

'ভেতরে ওরা ডাইভার্টার মেশিন প্রায় বানিয়ে ফেলেছে,' বলল রানা। 'আমরা দু'জন অতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারব, এমন আশা না করাই ভাল। একমাত্র উপায় মন্দিরটা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া।'

'ওদের কি হবে, সার?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কাসিম। 'ডক্টর বাদল, নেহাল...'

'ওদেরকে অবশ্যই বের করে আনব। অন্তত চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না। তবে একান্ত যদি বের করে আনতে না পারি, তারপরও মন্দিরটা উড়িয়ে দিতে হবে।'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে কয়েক মুহূর্ত নড়তে পারল না

কাসিম। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কতটুকু লাগবে, সার?'

'প্রচুর। কয়েক বাক্স।'

'অত বিস্ফোরক আপনি মার্গুই বা তাভয়েও পাবেন না,' বলল কাসিম। 'পেতে হলে ইয়ানগনে যেতে হবে।'

'যেতে হবে কেন, অর্ডার দিলেই তো হয়,' বলল রানা। 'সবচেয়ে কাছের টেলিফোনটা কোথায়?'

'টেলিফোন, সার?' কাসিম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'এই জঙ্গলে আপনি টেলিফোন পাবেন কোথায়?'

'কেন, তুমি আমাকে অভিজাত এক জমিদারের গল্প শোনাওনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোকোব্যাং না কি যেন নাম জায়গাটার? বিশাল এক জায়গা কিনে একটা খামারবাড়ি গড়ে তুলেছেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, শহরেও তাঁর ব্যবসা আছে...'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ! ইয়া আল্লাহ! আপনি তো দেখছি সার সব মুখস্থ করে রেখেছেন! অথচ আমারই মনে ছিল না।'

'শহরে যখন ভদ্রলোকের ব্যবসা আছে, তাহলে টেলিফোন তো থাকারই কথা। আর টেলিফোন না থাকলে রেডিও বা ওয়ায়্যারলেস থাকতে বাধ্য।'

'আমি যতদূর জানি, আছে একটা রেডিও।' আবার মাথা চুলকাল কাসিম। 'তবে, সার, বুড়ো জমিদার তাঁর রেডিও ব্যবহার করতে দেবেন কিনা বলতে পারি না। ওদিকের সৈকত অত্যন্ত দুর্গম, কোন জাহাজ-টাহাজও ভিড়তে পারে না...'

'ঠিক আছে, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমিই কথা বলব। এখান থেকে কত দূর কোকোব্যাং? পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'পনেরো কিলোমিটার পথ, সার,' বলল কাসিম। 'রাত তো হয়েই গেছে, এখন রওনা হলে সকালের মধ্যে পৌঁছে যাব।'

মন্দিরের গা ঘেঁষে এগোল ওরা, জঙ্গলে ঢুকে খুঁজে নিল সাপ্লাই

লুকিয়ে রাখার জায়গাটা। মাটি খুঁড়ে অতিরিক্ত একটা ল্যুগার, একটা কম্পাস ও এক জোড়া ক্যানটিন বের করল কাসিম। যে যার কাঁধে একটা করে ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলিয়ে নিল ওরা, ন্যাপস্যাক দুটো আবার ঘন ঝোপের ভেতর ঢুকিয়ে রাখা হলো।

ইয়াসিনের বদলে গাইডের কাজ করছে কাসিমের কম্পাস, টর্চের আলোয় পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরল ওরা। পথ বলতে কিছু নেই, গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক গলে এগোতে হচ্ছে। তবে রাত আরও গভীর হতে, বারোটার পর, সরু একটা পথের দেখা পাওয়া গেল। পথটা রানা চিনতেও পারল। আরও মাইল দুয়েক হাঁটতেই জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা জীপ দুটো খুঁজে পেল ওরা।

ড্রাইভিং সিটে বসল কাসিম। ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল জীপ। রানার হাতে রাইফেল। হেডলাইটের আলোয় কোন বককে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। 'ভদ্রলোকের নাম কি?' এক সময় কাসিমকে জিজ্ঞেস করল ও।

'উনি বিখ্যাত কোইবু পরিবারের সর্বশেষ জমিদার, নাম তুবাই হানসু কোইবু। কয়েকশো কোটি টাকার মালিক ভদ্রলোক, অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী।'

'এরকম দুর্গম আর বিপজ্জনক একটা জায়গায় শেষ জীবনটা কাটাচ্ছেন, ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভদ্রলোক ব্যবসায়ী হলেও, আর্কিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন,' বলল কাসিম। 'শেষ বয়সে তাঁর মনে হলো শিক্ষাটা কাজে লাগানো দরকার। এলাকায় তিনি প্রথমে আসেন আর্কিওলজিকাল সাইট দেখতে। জায়গাটা এতই পছন্দ হয়ে যায়, প্রায় পাঁচশো একর জায়গা সরকারের কাছ থেকে লীজ নেন। খামার তো গড়েছেনই, তাঁর লীজ নেয়া জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে।'

রানা বলল, 'মায়ানমারের এদিকটাকে ড্রাগ স্মাগলারদের স্বর্গ বলা হয়। হানসু কোইবু কোনভাবে জড়িত নন তো?'

'না, সার, অসম্ভব!' কাসিমের যেন মন খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু রানা সহজে ছাড়ছে না। 'আইএসআই বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহী গ্রুপকে অস্ত্র ও টাকা দিয়ে সাহায্য করে। এই টাকা ওরা সংগ্রহ করে ড্রাগ ব্যবসা থেকে। দুর্গম এলাকায় স্থানীয় লোককে নিজেদের এজেন্ট হিসেবে বসিয়ে রাখে ওরা, তার মাধ্যমে অস্ত্র ও টাকা বিলি করা হয়। তোমার হানসু কোইবু সেরকম একজন নয়তো–আইএসআই এর স্থানীয় এজেন্ট?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল কাসিম, কথা না বলে মাথা নাড়ল শুধু।

ঘোরা পথ ধরে যেতে হচ্ছে, দূরত্ব বেড়ে দাঁড়াল প্রায় পাঁচ গুণ, সত্তর কিলোমিটার। ইতিমধ্যে ক্যানটিন খুলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে ওরা। এখনও খালি হয়নি, তারপরও জীপ থামিয়ে জেরি ক্যান থেকে ত্রিশ লিটার পেট্রল ঢালা হলো ফুয়েল ট্যাংকে। দূরত্ব যাই হোক, ভোর বেলা কোইবুর খামারে পৌঁছে গেল ওরা। মাঠের একপাশে হেলিপ্যাড দেখা গেল, তবে কোন কপ্টার নেই। মূল বাড়িটা অবশ্য আরও অনেকটা দূরে।

বাড়িটা এত বড় হবে বলে আশা করেনি রানা, বানানো হয়েছে আশপাশের এলাকা থেকে উঁচু একটা জায়গায়, ফলে সাগরটা দু'দিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাড়ির চারপাশে নিচু একটা পাথরের পাঁচিল আছে, মাত্র চার ফুট উঁচু, ফুল আর লতাগাছে পুরোটাই ঢাকা। চওড়া একটা খোলা গেট দিয়ে জীপ নিয়ে এমন ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল কাসিম, বাড়িটা যেন তার নিজেরই। ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল মাত্রা ছাড়ানো শান্ত এক জোড়া কুকুর, আর সাত কি আট বছরের স্থানীয় এক আদিবাসী ছেলে। কুকুর দুটো জীপের চাকা শুঁকল, মুখ তুলে একবার দেখল ওদেরকে, তারপর গেটের দু'পাশে শুয়ে পড়ল আবার।

বাড়িটা একতলা, তবে তিন দিকে বিস্তৃত। ছাদের মাথায় একটা রেডিও অ্যান্টেনা দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা। কাসিম

বলল, 'আমি জেনারেটরের আওয়াজও পাচ্ছি।'

বাড়ির ভেতর থেকে আদিবাসী এক বুড়ি বেরিয়ে এলো, দেখেই বাচ্চা ছেলেটা ছুটে গেল সেদিকে। বুড়ি সারং পরে আছে, তাতে আঙুল মুছে কোমরে হাত রাখল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই? কোত্থেকে আসা হয়েছে?'

'আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি,' রানার শেখানো কথা আওড়ে গেল কাসিম। 'খুব ক্লান্ত। কিছু খেতে আর খানিকটা বিশ্রাম নিতে চাই। তোমার মনিবকে গিয়ে বলো, তাঁর যদি দয়া হয়।'

বুড়ি চলে গেল। ফিরে এলো তিন মিনিট পর। পোকায় খাওয়া দাঁত বের করে হাসছে, সেই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডাকছেও। জীপ থেকে নেমে বুড়ির পিছু নিল ওরা।

হলরুমটা বেশ বড়। সুইচ টিপে সবগুলো আলো জ্বেলে দিল বুড়ি। সব ফার্নিচারই অ্যান্টিকস বলে মনে হলো। ঝাড়বাতিগুলো সম্ভবত ফ্রান্স বা বেলজিয়াম থেকে আমদানি করা। দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা শো-কেস দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে অসংখ্য আর্টিফ্যাক্ট সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাচীন লিপি বা চিত্রসহ পাথর খণ্ডও অনেকগুলো দেখল রানা, দেয়ালে তৈরি শেলফে রাখা হয়েছে। প্রাচীন বর্মী শিল্পের মিউজিয়ামই বলা যায় হলরুমটাকে।

হলরুমের ভেতরে নিঃশব্দে ঢুকলেন হানসু কোইবু-তিনি ঠিক নিজে ঢুকলেন না, তাঁকে বয়ে নিয়ে এলো ইস্পাত ও ফোম দিয়ে বানানো একটা হুইল চেয়ার। হানসুর বয়স হবে আশির ওপর, ছোটখাট শরীর, তবে চোখ দুটো ভারি উজ্জ্বল। 'শুধু অবাক হইনি, খুশিও হয়েছি। পথ হারানো তো দূরের কথা, এই জঙ্গলে ভয়ে কেউ ঢোকেই না। তা আপনারা?'

বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মকর্তা, সেইসঙ্গে সৌখিন আর্কিওলজিস্টও-এভাবে নিজের পরিচয় দিল রানা-ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়েই মায়ানমারে এসেছে, তবে শুধু বেড়ানোই উদ্দেশ্য নয়, কিছু কঠিন দায়িত্বও ওকে পালন করতে হতে পারে; হ্যাঁ, কোন সন্দেহ

নেই যে ওর উপস্থিতি ও তৎপরতা অবশ্যই মায়ানমার সরকারের স্বার্থের অনুকূলেই যাবে। কাসিম গাওয়াকে নিজের গাইড বলে পরিচয় করিয়ে দিল ও। তারপর প্রসঙ্গের খেই ধরেই জানতে চাইল, 'সাধারণ মানুষ যেখানে এই জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পায়, আপনি সেখানে বছরের পর বছর শান্তিতে বসবাস করছেন কিভাবে?'

বৃদ্ধ হাসলেন। 'এর উত্তর এত সহজ, অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। আমি যখন এখানে আসি, জঙ্গলে বাঘ ছিল মাত্র বারোটা। এখন আছে মোট আশিটার মত, সম্ভবত বিরাশিটা। লোকজন, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আগে প্রচুর বাঘ মেরেছে। আমি আসার পর বারণ করায় আর কেউ মারে না। বাঘ হলো বকেদের দেবতা। দেবতাদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি আমি, তাই আমাকে ওরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।'

রানা বলল, 'আপনাকে এত যখন শ্রদ্ধা করে, আপনি বললে হয়তো অনেক অন্যায় অভ্যাস ছেড়েও দিতে পারে ওরা।'

'ও, আপনি নরবলি দেয়ার কথা বলছেন।' বৃদ্ধ কোইবু মাথা নাড়লেন। 'বকেরা বড় অদ্ভুত জাত, মিস্টার রানা। ধর্মীয় ব্যাপারে কারও কোন কথা শুনতে পর্যন্ত রাজি নয় ওরা। ওদের কথা বাদ দিন, আপনারা এদিকে কোথায় এসেছিলেন বলুন তো?'

'এসেছি আদিবাসী বকদের প্রাচীন এক মন্দির দেখতে,' ভেবেচিন্তে কথা বলছে রানা। 'কিন্তু গাইড কাসিম গাওয়া আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে এতই উদ্বিগ্ন যে ইচ্ছা করে ভুল পথ ধরে বলছে মন্দিরটাকে হারিয়ে ফেলেছে।'

বৃদ্ধ হানসু কোইবু অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'আপনার গাইড মিস্টার গাওয়া পথ ভুল করে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন বলেই আমার ধারণা। ওই মন্দির সম্পর্কে আজকাল অনেক বিপজ্জনক কথা কানে আসছে...

'কি রকম?'

কি যেন চিন্তা করলেন হানসু কোইবু। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা নাড়লেন। 'দুঃখিত, মিস্টার রানা। আদিবাসী বকদের অনেক কাজের সঙ্গেই আমি একমত নই, কিন্তু ওদের সম্পর্কে এমন কিছু আমার বলা উচিত নয় যার ফলে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে হয়। আমার একটা প্ল্যান আছে–আরও বছর পাঁচেক চেষ্টা করলে ওদেরকে হয়তো মানুষ বানাতে পারব, ততদিন যদি বেঁচে থাকি। কিন্তু তার আগে ওদের বিরুদ্ধে কিছু করা বা বলা আমার উচিত হবে না।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল না, তবে রানা খুব হতাশ বোধ করছে। বৃদ্ধ কোইবুকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই, রেডিওটা উনি ব্যবহার করতে দেবেন না।

'আলাপের প্রচুর সময় পাওয়া যাবে,' বললেন বৃদ্ধ। 'এখন স্নান সেরে ভরপেট নাস্তা করুন, দু'চার ঘণ্টা ঘুমান, দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খান, তারপর রাতে ডিনারে বসে গল্প করা যাবে।' হুইল চেয়ারে ফিট করা ঘণ্টাটা বাজালেন দু'বার। তরুণী দুই চাকরানী ছুটে এলো। 'ভদ্রলোকদের গেস্টরুমে নিয়ে যাও। পাশাপাশি দুটো রুম খুলে দেবে। আর শোনো, কি খেতে পছন্দ করেন জেনে নিয়ো...'

গোসল, দাড়ি কামানো, নাস্তা, বিশ্রাম, এমন কি গোটা বাড়ি ঘুরেফিরে দেখা–সবই হলো, হলো না শুধু চুপিসারে হানসু কোইবুর রেডিওরুমে ঢোকার সুযোগ। প্রথম কারণ কামরাটায় বাইরে থেকে তালা দেয়া রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, যতবার পায়চারি করার ছলে ওই কামরার সামনে এলো রানা, চাকরানীদের কারও না কারও সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল–কেউ শরবত বা কফি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে, কেউ খবর দেয় গল্প করার জন্যে বাড়ির কর্তা ওকে খুঁজছেন, আবার কেউ জিজ্ঞেস করে, সারের কি ঘুমের ট্যাবলেট লাগবে?

রেগে উঠে রানা এক চাকরানীকে বলল, 'ও-সব কিছু না, আমার একটা রেডিও লাগবে!'

চাকরানী বেচারি নির্দেশটাকে আক্ষরিক অর্থেই নিল। খানিক পর ওই একই কামরার সামনে রানাকে খুঁজে বের করল সে, ওর হাতে ধরিয়ে দিল পাঁচ ব্যান্ডের একটা টেলিফানকেন ট্র্যানজিস্টর রেডিও। অগত্যা কি আর করে রানা, নিজের কামরায় ফিরে এসে বিবিসির খবর শুনতে বসল।

খবর পাঠক মূল হেডলাইনগুলো পুনরাবৃত্তি করছিল। যে খবর আগেই বসের কাছে পেয়েছে রানা, সেটাকে বিবিসি প্রধান খবর করেছে—চীন যে-সময় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছে ঠিক সে সময় গালফ অব থ্যাইল্যান্ডে ভারতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার 'অর্জুন'-এর উপস্থিতিকে মোটেও স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। চীন এ-ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছে। দ্বিতীয় খবরটা একই রকম গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করল বিবিসি—কাকতালীয় হলেও সত্যি, প্রায় একই সময়ে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আগামীকাল শুভেচ্ছা সফরে মায়ানমারের রাজধানী ইয়ানগনে পৌঁছাবে। জানা গেছে, এই সফরের তারিখ তিন মাস আগেই স্থির করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান নৌ-বাহিনী এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি গত বছর চীনের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে।

খবরগুলো শুনে স্বভাবতই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, তবে সেটার চেহারা এখনও আন্দাজ করতে পারছে না ও।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানার অস্থিরতাও বাড়ছে, লক্ষ করে কাসিম গাওয়া উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বেলা বারোটার দিকে রানাকে সে প্রশ্ন করল, 'করিডর খালি পেলে আপনি রেডিওরূমে ঢুকতে পারবেন? চাবি না থাকা সত্ত্বেও?'

'করিডর খালি পেলে অন্তত তালা খোলার চেষ্টা করা যায়.'

বলল রানা।

আর কিছু না বলে রানার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল কাসিম। পাঁচ কি সাত মিনিট পর ফিরে এলো সে, মুখে হাসি আর ধরে না। 'চলুন, সার।'

'কোথায়?' রানা অবাক।

'আমি করিডরে পাহারায় থাকব,' বলল কাসিম। 'আপনি রেডিওরূমে ঢুকে যতক্ষণ খুশি শিউলি ম্যাডামের সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'তালা?'

'খোলা পাবেন।'

'মানে?'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছে কাসিম। অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল সে, 'সব কথা সবাইকে বলা যায় না, সার–আমাকে মাফ করবেন। তালা খোলা আছে, করিডরও ফাঁকা পাবেন, শুধু এইটুকুই জেনে রাখুন; কিভাবে কি করছি তা আপনার না জানলেও চলবে।'

রানা ধমক দিল, 'না, চলবে না। সব কথা জানতে হবে আমাকে। বলো!'

মাথা চুলকাল কাসিম। 'বিশ্বাস করুন, সার, আমার কোন দোষ নেই। তবে, সার, ওদেরও কোন দোষ নেই। দোষ যদি কারও থাকে তো ওই বুড়ো কোইবুর।'

রানা রেগে যাচ্ছে। 'তোমার কথা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'সার, এ বাড়িতে পুরুষমানুষ বলতে ওই একজনই–বুড়ো কোইবু। আর চাকরানীরা সংখ্যায় দশ-বারোজন, একজন বাদে সবাই তারা তরুণী। বুড়ো ওদেরকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করেন। সেই স্নেহের মাত্রা এতই বেশি যে মেয়েগুলোর সর্বনাশ হতে পারে এই ভয়ে বাড়িতে কোন পুরুষের ঢোকা নিষেধ করে

দিয়েছেন, মেয়েগুলোকেও বাইরে বেরুতে মানা করে দিয়েছেন। এখন আপনি কল্পনা করুন, কি বিচ্ছিরি সমস্যায় পড়েছে বেচারিরা।'

হাসি চেপে রানা জিজ্ঞেস করল, 'তা তুমি একা কি ওদের সবার সমস্যার সমাধান করতে পারবে?'

'জ্বী-না, সার,' তাড়াতাড়ি বলল কাসিম। 'সমস্যা সমাধানের নামে ওদেরকে বিপদে ফেলার কোন ইচ্ছাও আমার নেই। আমি শুধু দু'জনের সঙ্গে একটু ভাব জমিয়েছি।'

'তা সামান্য এই কথাটা বলতে এত লজ্জা পাচ্ছিলে?'

আবার মাথা চুলকাল কাসিম। 'আসলে ব্যাপারটা সামান্য নয়, সার। রেডিওরূমের চাবি হাতে পাবার জন্যে আমাকে অনেক দূর এগোতে হয়েছে।'

'অনেকদূর এগোতে হয়েছে মানে?'

অন্যদিকে ফিরে কাসিম জবাব দিল, 'এক চাকরানীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতে হয়েছে আর কি। বলতে হয়েছে, ছ'মাস পর তার কাছে আবার আমি ফিরে আসব।'

'এই কথা শুনে তোমার হাতে মনিবের চাবির গোছা তুলে দিল সে?' রানা গম্ভীর। 'এই মেয়ে তো নিজের স্বার্থের জন্যে মনিবের ক্ষতিও করে বসতে পারে।'

মাথা নাড়ল কাসিম। 'চাবি সে দেয়নি, সার। চাইলে দিতও না, তার কোমরে চেইনের সঙ্গে ঝুলছিল, আমি খুলে নিয়েছি।'

'ও, তাই বলো।' আবার রানাকে হাসি চাপতে হলো। 'আর করিডর ফাঁকা রাখার কি ব্যবস্থা করেছ?'

'আপনাকে বললাম না; দু'জনের সঙ্গে ভাব জমিয়েছি? দ্বিতীয় মেয়েটি প্রথম মেয়েটির ছোট বোন।'

'ছি-ছি···,' রেগে গেল রানা।

তাড়াতাড়ি ওকে থামিয়ে দিল কাসিম। 'না, সার, আপনি যা ভাবছেন তা সত্যি নয়–প্রেমের অভিনয় আমি দু'জনের সঙ্গে নয়,

একজনের সঙ্গেই করছি। ছোটটাকে বলেছি, তুই শালী করিডরে পাহারায় থাকবি, ওদিকে কাউকে যেতে দিবি না, কারণ কেউ দেখে ফেললে তোর বোনেরই দুর্নাম হবে। তবে একটা লোভও দেখাতে হয়েছে...'

'ছ'মাস পর ওর বোনের জন্যে যখন তুমি ফিরে আসবে, সঙ্গে করে হবু শালীর জন্যেও একটা পাত্র যোগাড় করে আনবে, এই তো? তা বেশ। তবে সাবধান, কাসিম, এ এক রকম আগুন নিয়ে খেলা–সামলাতে না পারলে কপালে কিন্তু খারাবি আছে।'

'জ্বী, সার,' মাথা নিচু করে বলল কাসিম। 'সার, দেরি না করে এখুনি আপনার বেরিয়ে পড়া উচিত।' চাবিটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

এতটা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে কাজটা সারতে পারছে, রানার খুঁতখুঁতে স্বভাব ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারছে না। নানা রকম সন্দেহ জাগছে মনে। আদিবাসী বকদের মন্দির এখান থেকে বেশি দূরে নয়, আইএসআই সেই মন্দিরে রীতিমত ঘাঁটি গেড়ে বসল, এলাকার একমাত্র প্রভাবশালী জমিদার হানসু কোইবুকে কোনরকম ভেট বা সুবিধে না দিয়েই? মন্দিরে কি ঘটছে, এ নিয়ে ভদ্রলোক আলাপ পর্যন্ত করতে রাজি নন। কেন? ব্যাপারটা অবশ্যই সন্দেহজনক।

রানার আরও সন্দেহ, কাসিমকে বোকা বানানো হয়েছে। ও রেডিও অন করে শিউলিকে মেসেজ পাঠাতে শুরু করুক, হাতেনাতে ধরা হবে ওকে।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। শিউলির রেডিও খোলাই পাওয়া গেল। কি কি লাগবে তার একটা তালিকা দিল রানা। হেলিপ্যাডের লোকেশনটাও জানিয়ে দিল, চার্টার করা হেলিকপ্টারের পাইলট ঠিক ওখানেই যেন নামে। উত্তরে শিউলি জানাল, তালিকা ধরে কেনাকাটা করতে আর বিশ্বস্ত পাইলট

যোগাড় করতে কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে হবে তাকে। তবে সে চেষ্টা করবে রাত শেষ হবার আগেই যাতে সাপ্লাই পেয়ে যায় রানা।

রেডিও অফ করে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা, দেখল হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে দ্রুত ফিরে যাচ্ছেন হানসু কোইবু। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকালেন ভদ্রলোক, বললেন, 'আমি কিছু দেখিনি, কিছু শুনিওনি।'

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল রানার। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে ফিরে এলো নিজের কামরায়। দেখল উদ্বেগে উত্তেজনায় অধীর হয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে কাসিম।

'মিশন সাকসেসফুল, সার?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল সে।

'তোমারটার কথা বলতে পারব না,' হেসে উঠে জবাব দিল রানা। 'কারণ দুই বোনের কাউকেই করিডরে দেখলাম না। তবে আমার মিশন হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল।'

মুখ নামিয়ে মাথা চুলকাল কাসিম। 'সার, আমার মিশন টু হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল, কিন্তু সেটাই আমার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে।'

'মানে?'

'সার, ওরা ধৈর্য ধরতে না পেরে এখানে চলে এসেছিল!' কাসিম প্রায় কেঁদে ফেলে। 'দুই বোনই দাবি করছে, আমাকে তারা ভালবেসে ফেলেছে। নিজেরা চুলোচুলি করছিল, আপনার কথা বলে ভয় দেখানোয় আমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করছে...'

'বলিনি, সামলাতে না পারলে বিপদে পড়বে?' রানার চোখেমুখে কৃত্রিম উদ্বেগ। 'এরা আদিবাসী, সভ্য জগতের রীতি-নীতি মানে না, এখন যদি দুই বোনই তোমার ঘর করতে চায়, আমি একটুও অবাক হব না।'

'কি বলছেন, সার! আমি ওদেরকে বিয়ে করব?'

'কি করবে সেটা তোমার ব্যাপার।' রানা নির্লিপ্ত। 'কাকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তুমিই জানো। তবে বিয়ে যদি একান্ত করতে বাধ্য হও, প্রথমে ওদেরকে মুসলমান বানাতে হবে তোমার।'

হঠাৎ হেসে উঠল কাসিম। 'বুঝেছি, সার! আপনি আসলে আমাকে সমস্যার সমাধান জানিয়ে দিলেন। ওরা আদিবাসী বক তরুণী, জান থাকতে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে না, ফলে আমিও ওদেরকে বিয়ে না করার মোক্ষম একটা অজুহাত পেয়ে যাব।'

এই সময় সেই প্রৌঢ়া চাকরানী দোরগোড়ায় এসে খবর দিয়ে গেল, ডাইনিং রুমে লাঞ্চ দেয়া হয়েছে, ওদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছেন তার মনিব।

লাঞ্চ খাবার সময় অনেক গল্প হলো, তবে ভুলেও হানসু কোইবু রানাকে কোন প্রশ্ন করলেন না। একবার শুধু ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ঝামেলা পছন্দ করি না, তবে ভাল কোন কাজে কেউ হাত দিলে তাকে আমি বাধাও দিই না।'

সব ঠিকঠাক মতই চলছিল। এমন কি, হানসু কোইবু আরও একবার অনুরোধ করলেন, মেহমানরা যাতে রাতটাও তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে যান। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কাগুলো আসতে শুরু করল বিকেল থেকে।

হানসু কোইবুর বাসস্থান ও খামারবাড়ি, দুটোর মধ্যে তিন-চার মাইলের ব্যবধান। তাঁর খামারে আদিবাসী বকেরাই কাজ করে। খামার এলাকায় তাদের জন্যে আলাদা গ্রাম তৈরি করে দেয়া হয়েছে।

বাড়ির বারান্দায় বসে বৈকালিক চা-নাস্তা খাচ্ছে ওরা, পাঁচজন বককে আসতে দেখা গেল—পিঠে তীর-ধনুক, হাতে বর্শা। ওদেরকে দেখে ভুরু কোঁচকালেন হানসু কোইবু।

'কি ব্যাপার, মিস্টার কোইবু?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনি কোন বিপদের আশঙ্কা করছেন?'

হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। 'আরে না! বিপদ হবে কেন! ওরা আমার খামারে কাজ করে, কিন্তু এর আগে কখনও ওদেরকে এভাবে অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখিনি।'

লোকগুলো খোলা গেট দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল। হন হন করে হেঁটে আসছে ঘামে ভেজা মুখ চকচক করছে। পরনে কাপড় না থাকারই মত, তবে গা ভর্তি অলংকার ঠিকই পরেছে। রানা লক্ষ করল, পাঁচজনের মধ্যে একজনও মুখ তুলে ওদের কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

হানস্ কোইবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'তোমরা? হাতিয়ার নিয়ে? কি ব্যাপার, কাই?'

বকেরা বারান্দায় উঠে বৃদ্ধের পায়ের সামনে যে যার বর্শা ও তীর-ধনুক নামিয়ে রাখল। কারও মুখে একটা কথা নেই, পিছু হটে বারান্দা থেকে নামল তারা, ঘুরল, তারপর আগের মতই হন হন করে হেঁটে বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে।

'অদ্ভুত তো!' বৃদ্ধ কোইবুকে বিমূঢ় দেখাচ্ছে। 'ওদের এই আচরণের মানে কি?'

কিন্তু বিস্মিত হবার পালা এখনও শেষ হয়নি। গেটে আরও একদল বককে দেখা গেল। তারাও কেউ মুখ তুলে বারান্দায় দাঁড়ানো ওদের দিকে তাকাল না। বৃদ্ধ কোইবুর প্রশ্নের উত্তরে বোবা সেজে থাকল। বর্শা, তীর-ধনুক, ছুরি ও সরু তার—যার কাছে যে অস্ত্র আছে, সব বারান্দার মেঝেতে রেখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে এলো, ইতিমধ্যে প্রায় দুশো বক তাদের অস্ত্র জমা দিয়ে গেছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এখনও তারা মনিবের বাড়িতে আসছে। সবারই একটা উদ্দেশ্য, অস্ত্র জমা দিয়ে নিরবে প্রস্থান। না, তাদের মধ্যে একজনও কোইবুর কোন প্রশ্নের জবাব দেয়নি।

হতভম্ব বৃদ্ধ এক সময় রানার দিকে তাকালেন। দৃষ্টিতে

অভিযোগ। 'মিস্টার রানা, আপনি কি বলতে পারবেন, ঠিক কি ঘটছে এখানে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বিড়বিড় করল রানা। 'পারব।'

আট

প্রাচীন মন্দিরে ঘাঁটি গেড়ে আইএসআই কি করতে চাইছে, সংক্ষেপে সব ব্যাখ্যা করল রানা। নিজের ভূমিকা, কি কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছে, তাও গোপন করল না। স্বীকার করল, ও যে এখানে রেডিও ব্যবহার করতে এসেছে, এটা পিছু নিয়ে দেখে গেছে আইএসআই এজেন্টরা। তারা ওকে খুন করার জন্যে হানসু কোইবুর এই বাড়িতে হানা দেবে। ওকে তারা খুব শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে, তাই আইএসআই মন্দিরের পুরোহিতদের মাধ্যমে বকদেরও হামলায় অংশ নিতে বলেছে। এতে করে খামারের বকেরা উভয় সংকটে পড়ে যায়। পুরোহিতদের নির্দেশ অবশ্য পালনীয়, আবার খামার মালিক কোইবুর নিমক খেয়ে নিমকহারামি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়–কোইবুর বাড়িতে ঢুকে তাঁর মেহমানদের খুন করতে পারবে না। দলে দলে এসে অস্ত্র জমা দিয়ে উভয় সংকট থেকে মুক্তি খুঁজে পেতে চাইছে ওরা। পুরোহিতদের বলেছে, কোইবু বা তার মেহমানদের পক্ষে লড়ছে না তারা; আর অস্ত্র জমা দিয়ে মনিবকে জানিয়ে গেল, বিদেশী লোকদের পক্ষেও তারা লড়বে না।

'আইএসআই আসুক,' গম্ভীর সুরে বললেন বৃদ্ধ। 'আমি এই

বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

'কিন্তু আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা কি আপনার করা আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার কাছে একটা রাইফেল আর একটা পিস্তল আছে...'

ম্লান হাসল রানা। 'ওদের সঙ্গে লড়তে হলে কামান, হেলিকপ্টার গানশিপ, গ্রেনেড সহ একটা ছোটখাট সেনাবাহিনী লাগবে আপনার। কাজেই জেদ বাদ দিয়ে আমি যা বলি শুনুন। আগে জানটা বাঁচান, তারপর অন্য কথা।'

'আপনি বলছেন, জান বাঁচাবার উপায় তাহলে আছে?' এরকম বিপদের মধ্যেও বৃদ্ধ যেন কৌতুক করছেন রানার সঙ্গে।

'জান বাঁচাবার সুযোগ সব সময় থাকে,' বলল রানা। 'কাসিম, যাও, জীপ স্টার্ট দাও। মিস্টার কোইবুকে নিয়ে বকেদের গ্রামে যাব আমরা।'

বৃদ্ধ হাসলেন। 'আপনি তো দেখছি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন! কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে যে ওখানেই সবচেয়ে নিরাপদে থাকব আমরা?'

রানা বলল, 'আমরা নই। আপনি। কাসিম, জীপ স্টার্ট দেয়ার আগে বাড়ির সব ক'জন চাকরানীকে বলো, তারা যেন এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ কোথাও চলে যায়। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবে–এখানে থাকলে নির্ঘাত গুলি খেয়ে মরতে হবে।'

বারান্দা থেকে ছুটে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল কাসিম।

'কিন্তু আপনাদের কি হবে?' রানার একটা হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ কোইবু।

'কি হবে জানি না, মিস্টার কোইবু,' হাসিমুখে বলল রানা। 'শুধু জানি লড়াই করতে হবে আমাকে। জ্বী, এটাই আমার পেশা।'

দশ মিনিট পর রওনা হয়ে গেল ওরা। কাসিম রিপোর্ট করল,

প্রথমে চাকরানীরা কেউ বাড়ি সম্পূর্ণ খালি করে বেরিয়ে যেতে রাজি হয়নি। তাদের যুক্তি হলো, গোটা বাড়িতে আর্টিফ্যাক্ট ও জিনিস-পত্র যা আছে সে-সবের দাম কয়েক কোটি ডলার, তারা চলে গেলে সব লুঠ হয়ে যাবে। কাসিম তাদেরকে বুঝিয়েছে, যারা হামলা করতে আসছে তারা দেখামাত্র গুলি করবে। মেয়েগুলো তারপরও বাড়ি ছাড়তে রাজি হচ্ছে না দেখে পিস্তল বের করে ধাওয়া করে কাসিম, সব ক'টাকে বাড়ি থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দৌড় খাটাবার পর ফিরে এসে জীপে স্টার্ট দিয়েছে।

থমথমে গলায় জীপের পেছন থেকে বৃদ্ধ বললেন, 'ওরা সে ছোটবেলা থেকে এ-বাড়িতে আছে, বাড়ির প্রতিটি জিনিস ওদের প্রিয়।'

আদিবাসী বকেরা তাদের মনিবকে কিভাবে নেবে, আদৌ তাঁকে আশ্রয় দেবে কিনা, রানা আর কাসিমের সঙ্গেই বা কি ধরনের ব্যবহার করবে, কিছুই ওদের জানা ছিল না।

দূর থেকেই দেখা গেল সারি সারি প্রিফ্যাব্রিকেটেড ঘরগুলোর সামনে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বক খামার কর্মীরা, তারা যেন জানত যে হানসু কোইবু গ্রামে আসবেন। জীপ থামল। কাউকে কিছু বলতে হলো না। শ্রদ্ধায় ও বিনয়ে অবনত মস্তকে এগিয়ে এলো তারা, ধরাধরি করে হুইল চেয়ারটা জীপ থেকে নামাল। হুইলটা নিজেই চালাতে শুরু করলেন বৃদ্ধ কোইবু। বকদের সর্দারের বাড়িটা তিনি চেনেন, সরাসরি সেদিকেই যাচ্ছেন। তার একপাশে রয়েছে রানা, আরেক পাশে কাসিম। বকেরাও রয়েছে চারপাশে।

গ্রামটা আকারে বিশাল। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো পরিবার বাস করে এখানে। প্রিফ্যাব্রিকেটেড কুঁড়েঘরের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশি। হাত তুলে রানাকে গ্রামটা দেখালেন বৃদ্ধ। 'এটা আমি ওদেরকে তৈরি করে দিয়েছি। কাউকে কোন পয়সা দিতে হয়নি। এই গ্রামে স্কুল আছে, বিশুদ্ধ পানি আছে, নর্দমা আছে...'

হঠাৎ করেই আড়ষ্ট হয়ে উঠল পরিবেশ। হুইল চেয়ার স্থির হয়ে গেল। বকেরা কেউ তাদের মনিব বা মনিবের দুই মেহমানের দিকে এখন আর তাকাচ্ছে না।

অপেক্ষা করছে সবাই। কিন্তু, গুলির শব্দ থামছে না। বকেদের এই গ্রাম থেকে বৃদ্ধ কোইবুর বাড়িটা সোজা পথে দু'মাইলের বেশি হবে না, জীপ নিয়ে ঘুরপথে আসতে হওয়ায় তিন কি চার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। গুলির শব্দ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে ওরা। শুধু পিস্তল নয়, রাইফেল থেকেও গুলি করছে আইএসআই এজেন্টরা। প্রশ্ন হলো, খালি বাড়িতে কাকে গুলি করছে ওরা?

বৃদ্ধ কোইবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। বৃদ্ধ ওদেরকে গ্রামে থেকে যাবার কথা বললেন বটে, তবে সেটা বলতে হয় তাই বলা। নিঃশব্দ বকরা তাঁকে যথেষ্ট খাতির করলেও, আচরণ দেখে বোঝা গেল রানা ও কাসিমের উপস্থিতি মেনে নিতে পারছে না। রওনা হবার আগে কাসিমকে রানা বলল, 'তুমি যদি এখন আমাকে জিজ্ঞেস করো, কোথায় যাচ্ছেন? আমি উত্তর দেব, মরতে। জবাবটায় এতটুকু অতিরঞ্জন থাকবে না। এখন বলো, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে, নাকি দ্বিতীয় জীপটার কাছে পৌঁছে দেব, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে?'

জবাব দিতে এক সেকেন্ডও দেরি হলো না কাসিম গাওয়ার। 'ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাব। তবে আপনাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছি সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসার পর।'

'কিন্তু তুমি একজন প্রফেশনাল গাইড, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন আমার সঙ্গে থাকতে চাইছ?' প্রশ্নটা না করে রানা পারল না।

কয়েক সেকেন্ড কথা না বলে চুপচাপ গাড়ি চালাল কাসিম। তারপর বলল, 'তারমানে শিউলি ম্যাডাম আপনাকে কিছু বলেননি।'

'কি বলবে?'

'আমি আর আমার স্ত্রী সেনাবাহিনীতে চাকরি করতাম, সার,' বলল কাসিম। 'দু'জনেই আমরা ফটোগ্রাফার ছিলাম। এই এলাকায় সেনাবাহিনীর প্রতিটি অভিযানে থাকতাম আমরা মাস তিনেক আগে এরকম এক অভিযানে পিছু হটার সময় একশো সৈন্যের সঙ্গে আমার স্ত্রী বকেদের হাতে ধরা পড়ে। মাত্র তিনজন সৈন্য কোন রকমে পালিয়ে আসতে পেরেছিল তারা কি দেখে এসেছে শুনবেন?'

শুনবে কি শুনবে না, রানা কিছু বলতে রাজি নয় বলতে যদি কষ্ট হয় কাসিমের, তার না বলাই ভাল। আর বলে যদি হালকা হতে পারে, রানার শুনতে আপত্তি নেই।

'সৈন্যদের বন্দী করা হয় মন্দিরের ভেতর,' বলল কাসিম সন্দেহ নেই, সব কথা বলে হালকা হতে চাইছে সে 'সেখানে তারা উর্দুভাষী কিছু লোককে দেখে। লোকগুলো প্রস্তাব করে বন্দীদের বাঘের ঘরে ঢোকানো হোক বন্দীদের মধ্যে আমার স্ত্রীই ছিল একমাত্র মেয়ে। ওই উর্দুভাষী লোকগুলো তাকে নিজেদের জন্যে রেখে দেয়। তিন দিন পর, নিজেদের সুখ মিটে গেলে, তাকেই প্রথম ঢোকানো হয় দেবতা বাঘের ঘরে

আর কোন কথা হলো না রানা শুধু কাসিমের কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল একবার।

গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গিয়েছিল, কিন্তু আবার নতুন করে শুরু হতে জীপের গতি কমিয়ে আনল কাসিম। এক সময় স্টার্ট বন্ধ করে কান পাতল ওরা। হানসু কোইবুর বাড়িটা এখনও মাইলখানেক পশ্চিমে, কিন্তু গুলির আওয়াজ সেদিক থেকে আসছে না। 'কিছু বুঝতে পারছ, কাসিম?' জিজ্ঞেস করল রানা 'কাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করছে ওরা?'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না, সার,' বলল কাসিম। 'তবে আওয়াজটা বাড়ির দিক থেকে সাগরের দিকে সরে গেছে, এটুকু বলতে পারি।'

'কি ঘটছে জানতে হলে বাড়িটায় একবার ঢোকা দরকার,' বলল রানা। 'আড়ালও পাওয়া যাবে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখাও যাবে।'

'তবে সামনের দিক দিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না,' বলল কাসিম। 'পিছনের গেটটা আমি চিনি, ভেতরের পথ বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে—জীপ নিয়ে ঢুকলে অসুবিধে নেই, যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যাবে।'

'গুড। তাই চলো।'

বাড়িটা যে খালি পড়ে আছে, দূর থেকে ভাল করে দেখে প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিল ওরা, তারপর পিছনের খোলা গেটে জীপ থামাল। বাগানের রোমহর্ষক দৃশ্যই বলে দিল কি ঘটেছে বা ঘটছে। বৃদ্ধ কোইবুর দু'জন চাকরানী মুখ থুবড়ে ঘাসের ওপর পড়ে আছে, গুলি খেয়েছে কপালে আর বুকে। এরকম আরও দুটো লাশ পাওয়া গেল বাড়ির ভেতর। আইএসআই এজেন্টরা কোন বাছবিচার করেনি, সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি করে মেরেছে।

'আমার কথা শোনেনি ওরা,' লাশগুলো দেখে বলল কাসিম। 'আমরা চলে যাবার পর বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে আবার ফিরে এসেছিল।'

'সম্ভবত সবাই,' বলল রানা। 'বাকিগুলোকে ধাওয়া করে মারছে এখন।'

গোটা বাড়িটা একবার ঘুরে এলো ওরা। কিছুই চুরি যায়নি, এমনকি হলরুমের অমূল্য আর্টিফ্যাক্টগুলোও যেমন ছিল তেমনি আছে।

'এ-সব ওরা পরে নিয়ে যাবে,' বলল কাসিম। 'ওদের এখনকার জরুরী কাজ একটাই—আপনাকে খুন করা।'

রানা বলল, 'চলো ওদিকে যাই, যেদিকে গুলি হচ্ছে। দু'একটা মেয়েকে হয়তো এখনও বাঁচানো সম্ভব।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে রানার পিছু নিল কাসিম। বাড়ির পিছন দিকে এসে বারান্দায় বেরুতে যাবে, জানালা দিয়ে দেখল ওদের জীপের পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশাল দেহ, কুচকুচে কালো রঙ, দূর থেকে দেখেও তাকে চিনতে পারল রানা—মেজর এহসান। ইঙ্গিতে জীপের হুডটা কাসিমকে দেখাল ও। ওটা খোলা। এহসান সময় নষ্ট করেনি, প্রথম সুযোগেই গাড়িটাকে অচল করে রেখেছে এহসানের পাশে আরেকটা ছায়া মূর্তি এসে দাঁড়াল। একেও দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। শাহিদা নাসরিন।

ঘর বা বারান্দা থেকে গেটের মুখে দাঁড়ানো নাসরিন বা এহসানকে গুলি করাটা বোকামি হবে, লাগার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বরং গুলির আওয়াজ শুনে ছড়িয়ে থাকা শত্রুরা ছুটে আসবে এদিকে।

বাড়ির সামনের দিকে চলে এলো ওরা। নাসরিন আর তার সঙ্গীরা হেঁটে আসেনি, গাড়িটা আশপাশেই কোথাও থাকার কথা। তবে সেটা পেলেই যে পালানো যাবে, তা নয়। রাতের যে-কোন সময় সাপ্লাই নিয়ে হেলিকপ্টার আসার কথা। ওদেরকে হয়তো সকাল না হওয়া পর্যন্ত এই এলাকায় অপেক্ষা করতে হবে।

বাড়ির সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, কিছুই নড়ছে না। অবশ্য অন্ধকারে কত দূরই বা দেখতে পাচ্ছে ওরা, বারান্দা আর গেটের আলো মাত্র এক দেড়শো ফুট পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তবে ভুল যা হবার আগেই হয়ে গেছে, গেটের বাইরে বেরুবার সুযোগই পাওয়া গেল না—অন্ধকার থেকে ছুটে এলো এক ঝাঁক বুলেট।

জীপ আসার শব্দ পেয়ে নাসরিনের নেতৃত্বে পাকিস্তান আর্মির সৈন্যরা বেশির ভাগই ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে আসেনি, অন্ধকার জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে বাড়িটাকে এক রকম ঘিরেই রেখেছে।

রানা ও কাসিমও পাল্টা গুলি করল, তবে জঙ্গলে লুকানো

সৈনিকদের লক্ষ্য করে নয়, গেট ও বারান্দার বালব লক্ষ্য করে। বাড়ির সামনেটা অন্ধকার হয়ে যেতে কান পেতে অপেক্ষা করছে ওরা। বাড়ির পিছন দিকে ফেরার কোন মানে হয় না, বাধা দেবে নাসরিন আর এহসান। ডানদিকের পাঁচিল টপকালে গাছপালার আড়াল পাওয়া যাবে, কিছুদূর যাবার পর সামনে পড়বে সৈকত। ওদিকে প্রচুর বোল্ডার আছে, আড়ালের কোন অভাব নেই। রাতটুকু লুকোচুরি খেলে কাটাবার জন্যে আদর্শ জায়গা।

ওরাও ডান দিকে পাঁচিল টপকে বাড়ি ছেড়ে বেরুল, নাসরিনও দু'জন সৈনিককে নিয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতর রানা পালিয়েছে, বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে সৈনিকদের ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল সে। তার কণ্ঠস্বরে আক্রোশ ও ঘৃণার ভাব এত বেশি, অনুভব করে রীতিমত অসুস্থবোধ করল রানা।

কাসিমকে পাশে নিয়ে গাছপালার আড়াল থেকে খোলা ঢালে বেরিয়ে এলো ও। আরও একটা লাশ, চিৎ হয়ে পড়ে আছে, চোখ দুটো আধখানা চাঁদের ওপর স্থির। ঢালের নিচে সাদা ফিতের মত লম্বা দেখাচ্ছে সৈকতটাকে। তারপরই পাথরের রাজ্য। ঢেউগুলো ওই পাথরে লেগে জোর আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। দৃশ্যটা ভয়াবহ ও রোমহর্ষক। ওই ঢেউ-এর মধ্যে পড়লে বড় একটা জাহাজের ভেঙে চুরমার হতে খুব বেশি হলে মিনিট পাঁচেক লাগবে।

পিছনের চিৎকার কাছে চলে আসছে। যে-কোন মুহূর্তে সাদা বালির গায়ে ওদের কাঠামো পরিষ্কার দেখতে পাবে সৈনিকরা।

'এখন কি হবে, স্যার?' কাসিম হাঁপাচ্ছে। 'ওরা তো এবার ধরে ফেলবে আমাদের!'

'ওদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যে টার্গেটের সংখ্যা বাড়ানো দরকার,' বলল রানা। 'একটা দিক বেছে নিয়ে দৌড় দাও।' মাথা ঝাঁকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সৈকত ধরে ছুটল কাসিম। পিছন থেকে আবার বলল রানা, 'কাল কপ্টারের কাছে দেখা হবে।' শুনে হাত

তুলে নাড়ল কাসিম।

ঢালু সৈকত ধরে একশো গজ এগোলে রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো পাথরের অনেকগুলো স্তূপ পাওয়া যাবে, কোন কোনটা একাই একটা বাড়ির সমান, সেদিকে ছোটার সময় রানা ভাবছে পাকিস্তানীরা ওদেরকে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে কিনা। হুংকার, ধমক ইত্যাদি শোনা গেলেও বেশ কিছুক্ষণ হলো আর কোন গুলি হচ্ছে না। শক্তিশালী টর্চের আলো অন্ধকারে একটা সচল টানেল তৈরি করল, পাথুরে প্াহাড় আর সৈকতে ছড়িয়ে থাকা বোল্ডারগুলোকে ছুঁয়ে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে। তারপর সরু সৈকতে ফিরে এসে নিভে গেল।

দেখতে না পেলে কি, বালির ওপর ওদের দু'জনের পায়ের ছাপ তো আছে। ভাগ্য মেজর এহসানকে সহায়তা করছে, দাঁতে দাঁত ঘষে অভিশাপ দিল রানা। দিক বদলে সৈকতের আরও নিচে নেমে এলো ও, সাগরের পানি যাতে ওর পায়ের ছাপ মুছে ফেলে।

টর্চটা আবার জ্বলল। এবারও সরাসরি ওর গায়ে এসে লাগল না আলোটা। পিছন ফিরে তাকাল—পাহাড়ের গায়ে দশ-বারোটা ছায়ামূর্তি, অত্যন্ত ব্যস্ত ও উত্তেজিত ভঙ্গিতে সৈকতে নেমে আসছে। ঢেউ আছড়ে পড়ার প্রবল শব্দে ওদের চিৎকার চাপা পড়ে যাচ্ছে। এহসানের নেতৃত্বে সৈনিকরা একেবারে মরিয়া হয়ে ধাওয়া করেছে। পানি কেটে, ফেনার ওপর দিয়ে পালাচ্ছে রানা, চারদিকে তাকিয়ে কাসিমকে খুঁজছে। ওর গাইড যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে।

সৈকত ধরে কেউ একজন ছুটে আসছে, হাতে জ্বলন্ত টর্চ, আলো ফেলছে ভেজা বোল্ডারগুলোয়। আলোর টানেলটা স্পর্শ করল রানাকে, সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার হলো। আলোটা যখন গায়ে লাগল, মূর্তির মত স্থির ছিল ও। এঁকেবেঁকে ফিরে এলো, ওকে খুঁজছে।

পানিতে নেমে ডুব দিয়েছে রানা, মাথা তুলল একটা

বোল্ডারের আড়ালে। বোল্ডারটা বেশি বড় নয়, কিন্তু কয়েকটা ডুবো পাথরে বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র হয়ে ওঠা ঢেউগুলো প্রবল গর্জন ভুলে বিরতিহীন আঘাত করছে ওটাকে, ফলে পাষাণ ও হিংস্র জলোচ্ছ্বাসের মাঝখানে পড়ে গেল রানা। সাগরের আর্তনাদকে ছাপিয়ে গুলির শব্দ শোনা গেল, কিংবা হয়তো ভুল শুনছে রানা। যে-কোন একটা ঢেউ বোল্ডারের ওপর আছাড় দিয়ে হাড়গুলোকে গুঁড়ো আর মাংসগুলোকে থেঁতলে দিতে পারে, তা সত্ত্বেও সৈকত আর নিজের মাঝখানে বোল্ডারটাকে রাখতে চাইছে ও। একবার মনে হলো গুলির শব্দ স্পষ্টই শুনল। তবে ওই মুহূর্তে বুলেটকে ভয় পাচ্ছে না, আতংকিত হয়ে আছে আশপাশের অসংখ্য চোখা পাথর না ওকে গেঁথে ফেলে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল চোখা পাথরগুলোকে এড়িয়ে বড় একটা বোল্ডারের পিছনে আশ্রয় নেবে। পাথরটা ধরে ঝুলে রয়েছে, মোক্ষম একটা মুহূর্ত বেছে নিয়ে ডাইভ দিল পানিতে, দ্রুত সাঁতার কাটছে। সারফেসের নিচের স্রোতটা তীব্র, বেশ খানিকটা সাহায্য পাওয়া গেল। কিন্তু চোখের পলকে মিত্রটা হয়ে উঠল প্রাণের শত্রু। প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করল রানা, গভীর, খোলা সাগরের দিকে টানছে ওকে। অন্তরটা কেঁপে উঠল ওর। হায়-হায়, এ তো মহা বিপদ! তারপর পায়ে ঠেকল ডুবো একটা পাথর। ডুব দিয়ে সেটাই জড়িয়ে ধরল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর অনুভব করল, পাথরে লেগে ঢেউগুলো ভাঙার পর বিপুল জলরাশি যখন সাগরের দিকে ফিরতে শুরু করছে, সারফেসের নিচের স্রোত তখন আর তেমন জোরালো থাকে না। একটা করে ঢেউ ভাঙল, রানাও একটু করে বড় পাথরগুলোর দিকে এগোল। মিনিট পাঁচেক লাগল ওর নিরাপদ বোল্ডারগুলোর আড়ালে পৌঁছাতে। এই সময় ওর মনে পড়ল, কাসিমের কাছে ভারী দুটো ন্যাপস্যাক আছে: ওর মত তাকেও যদি সাগরে নামতে হয়, বেচারা নির্ঘাত ডুবে মারা যাবে।

বোল্ডার বেয়ে চূড়ায় ওঠা সহজ হলো না, কিছুদূর উঠলেই

একটা করে ঢেউ এসে বিস্ফোরিত হয় পায়ের নিচে, পানির তোড় নামার সময় ওকেও টেনে নিচে ফেলে দেয়। তবে বারবার চেষ্টা করে একবার সফল হলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে সাগর ও ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ও–বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্যের হাসি নয়, সমীহ ও কৃতজ্ঞতার হাসি।

এবার সামনে, অর্থাৎ সৈকতে কি ঘটছে দেখা দরকার। টর্চের আলো আগের মতই অন্ধকারে টানেল তৈরি করছে, হারিয়ে যাচ্ছে কোন গুহার ভেতর, কখনও বা সরাসরি রানার দিকে ছুটে আসছে। তবে ও নিশ্চিত, এত দূরে ওকে দেখতে পাবে না তারা, বিশেষ করে যেহেতু দাঁড়িয়ে নেই।

আশপাশে আরও অনেক বড় বড় পাথর আছে, ইচ্ছে করলে জায়গা বদলে সারাটা রাত পাকিস্তানী সৈনিকদের ফাঁকি দিতে পারবে ও।

কিন্তু যখন কপ্টার আসবে? তখন কি করবে ও? রাত হোক বা সকাল, কপ্টারের আওয়াজ পেলে আড়াল থেকে বেরুতে হবে রানাকে। নাসরিন আর এহসান অবশ্যই বুঝে নিয়েছে যে রেডিও ব্যবহার করার জন্যেই হানসু কোইবুর বাড়িতে এসেছিল ও। রেডিও ব্যবহার করার দরকার কেন হয়, এটুকু বোঝার ক্ষমতাও তাদের আছে–হয় রিইনফোর্সমেন্ট দরকার, নয়তো সাপ্লাই। এয়ারস্ট্রিপ নেই, কিন্তু হেলিপ্যাড তো আছে–কাজেই ওরাও কপ্টার এঞ্জিনের আওয়াজ শোনার জন্যে কান পেতে থাকবে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে রানাকে ফিরতেই হবে, আর এটা জানা থাকায় ওত্ পেতে অপেক্ষা করবে তারা।

প্রায় এক ঘণ্টা ওদেরকে নিষ্ফল তল্লাশি চালাতে দেখল রানা। সৈনিকের সংখ্যা আরও বেড়েছে। পনেরোজনের কম নয়। নাসরিনের তীক্ষ্ণ গলাও দু'একবার ভেসে এলো ওর কানে। শুধু টর্চ নয়, এখন ওরা মশালও ব্যবহার করছে। এক ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিল তারা। লোকজন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে মেজর এহসান,

তবে পিছনে কয়েকজন গার্ড রেখে যাচ্ছে সে।

গার্ড হিসেবে যারা রয়ে গেল, কিছু শুকনো ডাল কুড়িয়ে এনে সৈকতে আগুন জ্বালছে। এই সুযোগে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাঁতরাতে শুরু করল রানা। খানিক পর সৈকতের যেখানে উঠল সেখান থেকে আগুনটা পঞ্চাশ গজ দূরে। একটা পাথরের আড়ালে শুয়ে মাত্র দু'জন সৈনিককে আগুনের সামনে বসে থাকতে দেখল ও, দু'জনেই একদৃষ্টে নাক বরাবর সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছোট ছোট পাথরের আড়াল পেয়ে ঢালু সৈকত বেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে সৈনিক দু'জনের পিছনে পৌঁছাল রানা, তবে এখনও তারা বিশ গজ দূরে। ক্রল করে এগোচ্ছে ও, মনে মনে বলছে–পিছন দিকে না তাকালে শাস্তি কিছুটা কম পাবি। দু'জনের একজন যেন ওর মনের কথা শুনতে পেল–বালির ওপর শুলো সে, ভাঁজ করা হাত দিয়ে দুটো চোখই ঢেকে ফেলল।

রানা পৌঁছে গেছে। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে শুয়ে পড়া লোকটার রাইফেল টেনে নিল। লোকটা বিড় বিড় করে বলল, 'সামহালকে রাখ না, দোস্ত।'

দ্বিতীয় লোকটা তার দিকে ফিরতে গেল, দেখল তার কপালের মাঝখানে তাক করা হয়েছে রাইফেলের মাজল, অস্ত্রের পিছনে ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে রানা।

'ইয়া আল্লাহ!' বলেই কোমরের হোলস্টারে হাত দিল লোকটা। কক করে ট্রিগার টেনে দিল রানা। পরপর দু'বার, টার্গেটও দুটো, কারণ প্রথম লোকটাও চোখ থেকে হাত সরিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছিল।

রিভলভার দুটো বেল্টে গুঁজে রাখল রানা। রাইফেল দুটোও ঝুলিয়ে নিল দুই কাঁধে: কাসিমকে জীবিত ফিরে পাবে, এই আশা ত্যাগ করতে রাজি নয় ও।

সৈকতে উঠে আসা ছোট ছোট ঢেউ-এর ওপর দিয়ে মাইল

দুয়েক হাঁটল রানা. তারপর একটা বোল্ডারের সমতল মাথায় উঠে শুয়ে পড়ল। ঘুমাবে না, তবে ঝিমাবে। ভোর হতে খুব বেশি দেরি হলো না। গাঙচিলগুলো যেন ওকে তাগাদা দেয়ার জন্যে গলা ফাটাচ্ছে। পাশেই জঙ্গল, পাখিরাও চুপ করে নেই। আশপাশেই কোথাও রাত কাটিয়েছে পাকিস্তানীরা, অস্পষ্ট হলেও তাদের গলার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। নাসরিন আর এহসান সম্ভবত নতুন করে সার্চ পার্টি গঠন করছে তবে এখনকার খেলাটা আগের মত এক তরফা হবে না।

সৈকতে ছড়ানো পাথরগুলোর আড়ালে থেকে আরও দু'মাইল দক্ষিণে এগোল রানা, তারপর চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। হেলিপ্যাডটা কোন দিকে, এটা বোঝার জন্যে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হলো। তারপর সরু একটা পথ চিনতে পেরে আরও দু'মাইল হাঁটল উত্তর দিকে। এক সময় ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পেল, কিন্তু জঙ্গলের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকল, বেরুল না। বেশিক্ষণ লাগল না, ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকে, প্রায় একশো গজ দূরে, আরেকটা ঝোপের ভেতর লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল ও

এক ঘণ্টা পার হলো। তারপর আরও এক ঘণ্টা। কিছুই ঘটছে না। ঝোপের ভেতর বসে মশার কামড় খাচ্ছে। সরু একটা পথ দেখতে পাচ্ছে ও, জানে পথটা হানসু কোইবুর বাড়ির দিকে চলে গেছে। ঝোপের ভেতর থেকে রেডিওর অ্যান্টেনাটা দেখতে পাচ্ছে ও।

রানা নড়ছে না। উল্টোদিকের ঝোপে প্রতিপক্ষও স্থির।

আড়াই ঘণ্টা পার হতে চলেছে, এই সময় দূর থেকে ভেসে এলো কপ্টার এঞ্জিনের অস্পষ্ট গুঞ্জন।

রানার উপস্থিতি প্রতিপক্ষ কি টের পেয়ে গেছে?

কিছুই সন্দেহ করেনি, হেলিপ্যাডে নিরাপদেই ল্যান্ড করল

রানা এজেন্সির চার্টার করা হেলিকপ্টার। রোটর তখনও ঘুরছে, দরজা খুলে দিল কো-পাইলট। তবে সিট থেকে নামছে না, মাথা থেকে হেডসেটটাও খুলছে না। লোকটাকে আকারে একটু ছোটখাটই বলতে হবে।

খোলা দরজা দিয়ে পাইলটকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। কালো লেদার সুট পরেছে সে, স্কিন-টাইট, তবে হাঁটু, বুক, পাঁজর আর বাহুর কাছে চওড়া ও গভীর পকেট আছে কো-পাইলটও লেদার সুট পরে আছে। খোলা দরজা দিয়ে সে-ই নামল।

ঝোপ এক রকম ভেঙেই বেরিয়ে এলো পাকিস্তানীরা, সবার আগে নাসরিন আর এহসান। আটজন সৈনিক রয়েছে ওদের সঙ্গে। কপ্টারের কাছে পৌঁছেই এহসান কর্কশ গলায় নির্দেশ দিল, 'কার্গো নামাও!'

কো-পাইলটকে ঠেলে কপ্টারে উঠল দু'জন সৈনিক। সাপ্লাইয়ের বাক্সগুলো ধরাধরি করে দরজার সামনে আনছে তারা, বাকি সৈনিকরা সেগুলো নিয়ে ফাঁকা জায়গাটার একপাশে সাজিয়ে রাখছে।

লম্বা-চওড়া কো-পাইলটকে পাকিস্তানীরা কোন রকম পাত্তাই দিচ্ছে না। কপ্টার থেকে নামানো সাপ্লাইয়ের বাক্সগুলো পরীক্ষা করতে ব্যস্ত তারা।

ঝোপের ভেতর থেকে শান্ত, প্রায় অলস ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো রানা। একটা রাইফেল কাঁধে, অপরটা হাতে বাগিয়ে ধরা।

নাসরিনই প্রথমে দেখতে পেল ওকে। দেখেই চিৎকার করে বলল, 'ওই তো!'

সরাসরি তার দিকে রাইফেল তাক করল রানা, বলল ভুলেও যেন একচুল না নড়ে। এহসান হোলস্টারে হাত দিতে যাচ্ছে, রানা নিষেধ করল না, ব্যারেল একটু ঘুরিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছন দিকে উড়ে গেল এহসান, বুক-পিঠ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে। ভারী বস্তার মত ঘাসের ওপর পড়ে

একটুও নড়ছে না।

সাপ্লাই ফেলে সৈনিকরা পালাচ্ছে, আবার গর্জে উঠল রানার রাইফেল, এবার ওটার সঙ্গে রবিনের পিস্তলও। সবচেয়ে বিস্মিত করল নাসরিন। দু'হাত দিয়ে বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠল সে, উন্মাদিনীর মত ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এহসানের লাশের ওপর। মাত্র দু'সেকেন্ড। লাশটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে, এহসানের পিস্তল দিয়েই, রানাকে টার্গেট করল সে। হতচকিত রানা রাইফেল তোলার সময় পাবে না। কো-পাইলট, রানা এজেন্সির ইয়ানগন শাখার অপারেটর রবিন, পিস্তল হাতে ধাওয়া করছে পাকিস্তানী সৈনিকদের। তা সত্ত্বেও, নাসরিন গুলি করার আগে, আরেকটা গুলি হলো। সেই গুলি খেয়ে আইএসআই এজেন্ট নাসরিন ও তার অভিনয় প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটল।

নিজের দিকে খোলা জানালা দিয়ে কপ্টারের পাইলট শিউলি সামাদ গুলিটা করেছে।

রানার মনে পড়ল রাহাত খান ওকে বলেছেন, ট্রেনিং পিরিয়ডে খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল শিউলি, সেজন্যেই তাকে সরাসরি ইয়ানগন শাখার প্রধান করে মায়ানমারে পাঠানো হয়েছে। না, বস্ কোন ভুল করেননি।

পিছনের ঝোপের একটা ডাল মট করে ভাঙল। ঘুরেই সেদিকে রাইফেল তাক করল রানা।

'করেন কি, সার! আমি কাসিম্ গাওয়া!'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড!' কাসিমকে দেখে ভারি খুশি রানা।

'গুলির শব্দ শুনে ভাবলাম,' সহাস্যে বলল সে, 'আপনার বোধহয় সাহায্য দরকার...'

নয়

শিউলির বাড়ানো হাত থেকে বিনকিউলারটা নিয়ে নিচের অবিচ্ছিন্ন বনভূমির ওপর চোখ বুলাল রানা। গাছপালার মাথা ঘেঁষে দক্ষিণ-পুব দিকে ছুটছে ওদের হেলিকপ্টার। কাসিম এক সময় জানাল, আর এগোবার দরকার নেই, এখানেই বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে দেখা যাক।

একবার নয়, তিন-তিনবার চক্কর দেয়ার পর আকাশ-ছোঁয়া গাছগুলোর ভেতর পিরামিড আকৃতির প্যাগোডা বা প্রাচীন মন্দিরটার ক্ষীণ আভাস পাওয়া গেল মাত্র। নিশ্চতভাবে চেনা গেল রোদ লেগে ইস্পাতের রাডার স্কোপ ঝিক করে ওঠায়। এরপর ফাঁকা জায়গাটা খুঁজে বের করতে একমিনেটের বেশি লাগল না রানার। আঙুল দিয়ে শিউলিকে দেখাল ও। 'ওখানে নামো।'

হেলিকপ্টার নামার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কাজ শুরু করল ওরা। রানার হাত থেকে ভারী বাক্সগুলো নিয়ে ঝোপের ভেতর রেখে আসছে কাসিম গাওয়া। রানার নির্দেশ আগেই পেয়েছে শিউলি, কার্গো নামানো শেষ হওয়ামাত্র কপ্টার নিয়ে ফিরে গেল।

সাপ্লাই-এর বাক্সগুলো যে ঝোপের ভেতর লুকানো হয়েছে, তার আশপাশে পায়ের যত ছাপ পড়েছে সব ওরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মুছে ফেলল।

'আল্লাহ মেহেরবান,' বিড়বিড় করে বলল কাসিম। 'তা না হলে এখনও আমরা বেঁচে আছি কি করে? তবে ভাগ্যকে নিয়ে

জুয়া খেলা কিন্তু ঠিক নয়, সার।'

'মানে?'

'আপনি কি কাঁধে বিস্ফোরকের বাক্স নিয়ে স্রেফ হেঁটে মন্দিরে ঢুকতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, তাই,' বলল রানা। 'তবে এই কাপড়চোপড় পরে নয়। ইয়ানগন থেকে অর্ডার দিয়ে যে-সব জিনিস আনিয়েছি, ওগুলো ব্যবহার করে দু'জনেই আমরা আদিবাসী বক হয়ে যাব।' বাক্স খুলে প্যাকেটগুলো বের করল রানা। নানা রকমের রঙ, পাখির পালক, তীর-ধনুক, ভাঁজ করা বর্শা, এমন কি কোমরের বিছে পর্যন্ত বেরুল প্যাকেটগুলো থেকে—বিছে আর অলংকারগুলো আসলে ইমিটেশন। ট্রাউজার ও আন্ডার প্যান্ট খুলে কৌপীন পরল ওরা, পায়ে দিল ঘাসের তৈরি স্যান্ডেল, কপালে জড়াল চামড়ার পট্টি। ওই পট্টির ভেতর ছোট ছুরি লুকিয়ে রাখা যায়।

ছদ্মবেশ নেয়া শেষ হতে কাসিমকে ব্রিফ করল রানা। 'আমাদের মূল কাজ হবে কারখানা বা ল্যাবরেটরির যতটা সম্ভব কাছাকাছি বিস্ফোরক ফিট করা।'

'কিন্তু গার্ডদের চোখকে ফাঁকি দেব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল কাসিম, দৃষ্টি দেখে মনে হলো রানাকে পাগল বলে সন্দেহ করছে। 'মন্দিরের ভেতর কোথায় না নেই ওরা।'

'থাকুক না,' বলল রানা। 'আমরাও তো ওদের মতই দেখতে হচ্ছি। একটু সাবধান থাকলে ওরা বুঝতেই পারবে না কি করছি আমরা।'

'ঠিক আছে, ধরে নিলাম বিস্ফোরক ফিট করা সম্ভব,' বলল কাসিম। 'তারপর কি? সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে দেব? ডক্টর চৌধুরী, নেহাল, আমি, আপনি—একজনও তো বাঁচব না।'

'শোনো, কাসিম।' রানা শান্ত অথচ গম্ভীর। 'তোমাকে একটু বলি পরিস্থিতি কতটা সিরিয়াস। ধরে নাও, ডাইভার্টার মেশিন বানাবার কাজ বাদল চৌধুরী ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছেন।

মেশিনটায় ছোটখাট, সামান্য কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। আজ বারো তারিখ, কাল তেরো তারিখ সকালে চীন তার নিউক্লিয়ার ওঅরহেড পরীক্ষা করবে। ডক্টর এলাহি আর তার সহকারীরা ডাইভার্টার মেশিনটার সাহায্যে বোমা সহ মিসাইলটা হাইজ্যাক করে ওটাকে ফেলতে চাইবে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। কিন্তু এটা নতুন একটা ডাইভার্টার মেশিন, ঠিকমত কাজ করবে কিনা যাচাই বা পরীক্ষা করা হয়নি। মিসাইলটা যদি বেইজিং বা সাংহাইয়ে পড়ে? কিংবা আরাকানে। এমনকি বাংলাদেশও বিপদসীমার মধ্যে রয়েছে, তাই না?'

চোখ বড় বড় করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কাসিম। কথা বলছে না।

'কাজেই, আমরা চারজন বাঁচলাম কি মরলাম,' আবার বলল রানা, 'এটা বড় কথা নয়। বড় কথা, যে-কোন মূল্যে ডাইভার্টার মেশিনটাকে ধ্বংস করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল কাসিম। 'জ্বী,' ফিসফিস করে বলল সে। 'এটা তাহলে আমারও যুদ্ধ, সার। বিপদসীমার মধ্যে মায়ানমারও যেহেতু রয়েছে।'

গায়ের রঙ বকেদের মত হুবহু তামাটে করে নিল ওরা। সবশেষে মার্কিং মোছার জন্যে বাক্সগুলোও রঙ করল। বাম কাঁধে হরিণের একটা চামড়া ঝুলিয়েছে রানা, স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো পিস্তলটা লুকানোই উদ্দেশ্য। প্রত্যেকে একটা করে জেলিগনাইট ভরা বাক্স কাঁধে ঝুলিয়ে নিল।

রওনা হবার পর রানার মনে হলো বনভূমিতে যেন ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। এখন যদি ঝোপের ভেতর থেকে একজন সৈনিক ওদের বাক্সে একটা গুলি করে, সঙ্গে সঙ্গে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে ওদেরকে।

কোথাও না থেমে, এতটুকু ইতস্তত না করে, ফাঁকা জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আঁকাবাঁকা পথটা পার হলো ওরা, শান্ত-

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভেতর। কিছুটা দূরে কয়েকজন আদিবাসী বক গার্ডকে দেখা গেল। ছদ্মবেশ এতটাই নিখুঁত হয়েছে, কেউ তারা ওদের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না। কিন্তু রানার অনুভূতি হলো, আড়াল থেকে ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। পথ দেখানোর জন্যে সামনে রয়েছে রানা, দুই কদম পিছনে রয়েছে কাসিম। খানিকটা স্বস্তি বোধ করল ওরা, কারণ আরও কয়েকজন আদিবাসী বক কাঁধে ভারী বস্তা নিয়ে এক প্যাসেজ থেকে আরেক প্যাসেজে যাচ্ছে। লম্বা একটা প্যাসেজ পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা–গার্ডরা এখানেই ওকে নিয়ে এসেছিল, পালাবার সময় একটা লাশ ফেলে গিয়েছিল ও।

থাম বা স্তম্ভটার দিকে এগোচ্ছে, ছায়ায় একজন গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। দু'জনের ওপর চোখ বুলালেও, পেশিতে টান পড়েনি। অল্প আলো ওদেরকে সাহায্য করছে। মুখটা আড়াল করার জন্যে ভারী বাক্সটা এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিল রানা। লোকটা ওদেরকে থামতে বলল না। তাকে পাশ কাটিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো ওরা।

ছ'জন বক বকবক করছে, ওদের গা ঘেঁষে হেঁটে যাবার সময় খুব কাছ থেকেই তাকাল, কিন্তু কেউ এতটুকু অবাক হলো না বা কিছু বলল না। রানা এখন ভাবতে সাহস পাচ্ছে, কাজটায় ওরা সফল হবে।

বেদি সহ কামরাটা খালি দেখল রানা। নৃত্যরত বক পুরোহিতরা তো নেই-ই, নেহালকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সরিয়ে ফেলা হয়েছে, নাকি ভোগ হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছে দেবতা বাঘকে?

পাথুরে দেয়ালের দিকে মুখ তুলে ল্যাবরেটরির প্যানেলটা দেখল রানা, বন্ধ দেখে স্বস্তি বোধ করল।

প্যাসেজ ধরে আসার সময় একটা মশাল নিয়ে এসেছে ওরা। সেটা খুলি আকৃতির পাথুরে হোল্ডারে ঢুকিয়ে কাসিমকে রানা

বলল, 'ওদিকের দেয়ালটার ওপর নজর রাখো। বিজ্ঞানীদের ল্যাবটা ঠিক ওপরেই।'

পাথরের তৈরি দেয়াল, তৈরি করা হয়েছে কয়েকশো বছর আগে। খাঁজ-ভাঁজ-ফাটল-গর্ত সবই থাকার কথা, এমনকি মেরামত করার পরও। একটা নয়, কয়েকটা গর্তই খুঁজে পেল ওরা। দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করছে, চার দেয়ালের গর্তে প্রচুর জেলিগনাইট ঢোকাল ওরা, প্রতিটির সঙ্গে টাইম বা ক্লক মেকানিকজম ফিট করা আছে। নেহাল আর বাদল চৌধুরীকে উদ্ধার করে মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে নিজেদেরকে রানা সময় বরাদ্দ করল মাত্র আধ ঘণ্টা। এখন থেকে ঠিক ত্রিশ মিনিট পর জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হবে। পরিমাণে তা এতই বেশি, গোটা মন্দির স্রেফ মিহি ধূলিকণা হয়ে বাতাসে উড়ে যাবে।

খালি বাক্সগুলো একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে রাখল ওরা। মশালটা হোল্ডার থেকে তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানা, করিডর ধরে ছুটছে।

সেই স্তম্ভটার আড়ালে এখনও বক গার্ডকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। কি কারণে কে জানে, এখন তাকে সতর্ক ও আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। দূরত্ব কমে আসতে পা বাড়াল সে, ওদের পথ আগলে দাঁড়াল, চোখে প্রশ্ন। কাসিম আড়চোখে তাকাল রানার দিকে। রানা দেখল, বেল্টে গোঁজা ছুরির দিকে হাত বাড়াচ্ছে কাসিম।

হাতের মশালটা নেড়ে পিছন দিকটা দেখাল রানা, বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য কয়েকটা শব্দও উচ্চারণ করল। বক গার্ড বিমূঢ়। শব্দগুলো বুঝতে না পারায় তার মুখ ঝুলে পড়ল, মশাল অনুসরণ করে রানার পিছন দিকে তাকাচ্ছে।

রানার তৈরি করে দেয়া সুযোগ কাজে লাগাল কাসিম, ছুরির ফলা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল বকের বাম পাজরের ফাঁকে। স্তম্ভের আড়ালে ঢলে পড়ল সে, কয়েকবার হাত পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল।

'এসো,' ফিসফিস করল রানা, প্যাসেজ ধরে ছুটল যেদিকে বাদল চৌধুরীর সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে।

ক'মিনিট পার হলো? ছদ্মবেশ নেয়ায় হাতঘড়ি পরেনি রানা, তবে মাথায় সময়ের একটা হিসাব রাখছে। ও নিশ্চিত, মোট বরাদ্দ ত্রিশ মিনিটের মধ্যে দশ মিনিট এরইমধ্যে বেরিয়ে গেছে।

ছোট্ট সেলের ভেতর ঢুকে হতাশ হলো রানা। সেল খালি।

'তাহলে নিশ্চয়ই ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওঁদেরকে,' বলল কাসিম। 'কিন্তু এখন আর ওপরে ওঠার সময় নেই আমাদের।'

মিসেস নেলী হাসানের মুখটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। মনে পড়ল, ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়েছে ও–নেহালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সেল থেকে বেরিয়ে ছুটল রানা, কাসিমের মৃদু প্রতিবাদ কানে তুলছে না। তার পায়ের শব্দ পিছিয়ে পড়ছে না দেখে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাল, সন্দেহ নেই সঙ্গী হিসেবে তিনি ওকে খাঁটি একটা রত্নই জুটিয়ে দিয়েছেন।

ছুটে বড় কামরাটায় ঢুকে পড়ল ওরা, ভেতরে কেউ আছে কিনা জানে না, জানল লোকগুলো ওদেরকে ঘিরে ফেলার পর। মুখে নকশা আঁকা দশ-বারোজন বক, সাত-আটজন পাকিস্তানী সৈনিক। ছেঁকে ধরে ছুরি, পিস্তল সব কেড়ে নিল তারা। বুটের দমাদম কয়েকটা লাথি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল রানা, ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। মনে রাখল, এই বুটের মালিক মেজর শাকিল। কাসিমেরও একই অবস্থা, লাথি খেয়ে সে-ও মেঝেতে গড়াচ্ছে। তবে, এরই মধ্যে রানার দিকে তাকাল সে। তার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে রানার অসুবিধে হলো না। সময় তো শেষ হয়ে আসছে!

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গার্ডদের ইশারা করল কর্নেল ফারুক সৈয়দ। রানা ও কাসিমকে দাঁড় করানো হলো, তারপর রাইফেলের মাজল দিয়ে গুঁতো মেরে করিডর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে

আসা হলো কারখানা তথা ল্যাবে।

ডক্টর বাদল চৌধুরী গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বেঞ্চে কাজ করছে।

'আপনার উদ্ধার কর্তা,' বলে হাসল মেজর শাকিল, 'নিজেই আবার বন্দী হয়েছে।'

মুখ তুলে তাকাল বাদল চৌধুরী। বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল তার চোয়াল। রানা যে এখনও বেঁচে আছে, এটা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

একটা মেশিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পাকিস্তানী বিজ্ঞানীদের প্রধান। পান চিবানো রাঙা ঠোঁটে হাসছে সে। 'তো, ব্রাদার রানা, আবার আমাদের মোলাকাত হলো। মানলাম, সত্যি, আপনাকে খুন করা বড় কঠিন কাজ আছে।'

ব্যথায় গোঁঙাচ্ছিল কাসিম, রানার হয়ে সে-ই জবাবটা দিল, 'ঠিক ধরেছেন। বারবার বেঁচে যাওয়াটা আমার সারের একটা অভ্যাস।'

'তাই তো দেখছি।' ডক্টর এলাহি এখন আর হাসছে না। 'শেষবার দেখা হবার পর কোথায় ছিলেন আপনি?'

'গো টু হেল!' রানার সংক্ষিপ্ত জবাব, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে রহস্যময় হাসি।

'ইঁদারা থেকে আপনি উঠলেন কিভাবে? তারপর ছিলেনই বা কোথায়?' ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ হচ্ছে ডক্টর এলাহির কণ্ঠস্বর। এখন আর উদ্বেগ-উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। 'ছদ্মবেশ নিয়ে ঢুকলেন–কি উদ্দেশ্যে? বাক্সগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

'নাসরিন বা মেজর এহসান ফিরছে না, ডক্টর এলাহি,' বলল রানা। 'সৈনিকরাও না। আপনি, আপনারা–আমরাও–কেউ থাকছি না।'

বোবা হয়ে গেল সবাই। স্থির, নিষ্প্রাণ মূর্তি যেন। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে। প্রথমে নড়ে উঠল মেজর শাকিল। 'বাক্সগুলোয়

বিস্ফোরক আছে!'

এই সময় তিনজন সৈনিক ঢুকল ল্যাবে, তাদের হাতে জেলিগনাইটের কয়েকটা করে স্টিক, টাইম মেকানিজম সহ। 'এগুলো আমরা বড় কামরাটায় পেলাম...'

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পাগলের মত হেসে উঠল ডক্টর এলাহি। 'ভেরি স্যাড, মিস্টার রানা, ভেরি স্যাড। আত্মহত্যা করবেন, আপনাদের ভাগোয়ান্ আপনাকে সে সুযোগও দিল না!'

'ভাগোয়ান?' কাসিম যেন বিষম খেলো।

'কেন, জানো না, বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা তো সবাই আসলে খাঁটি হিন্দু—মুসলমান তো স্রেফ নামকাওয়াস্তে।'

কাসিমকে রানা বলল, 'এই বেজন্মারা এ-কথা বলেই একাত্তর সালে ত্রিশ লাখ বাঙালীকে খুন করেছিল...'

'আমরা হিন্দু মেয়েদেরকে রেপও করেছিলাম,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মেজর শাকিল। 'সত্যি কথা বলতে কি, সে একটা বড় মজার সময় গেছে।'

'এই সময়টাও কম মজার নয়,' বলল ডক্টর এলাহি। 'পাকিস্তানকে ভেঙে দু'টুকরো করার অপরাধে এখন আমরা হিন্দুস্থানকে উচিত শাস্তি দেব। তেরো তারিখ সকালে গায়েব করে দেব দিল্লি। স্রেফ গায়েব! তেরো তারিখ দুপুরে হুড়মুড় করে ভারতীয় কাশ্মীরে ঢুকে পড়বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। চোদ্দ তারিখে ইসলামাবাদের প্রস্তাব পেয়ে ঢাকা ঠক-ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘোষণা করবে—বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এবার একটা কনফেডারেশন গঠন করেছে।'

ডক্টর এলাহি থামতে মেজর শাকিল ও সৈনিকরা হাততালি দিল।

হাত তুলে তাদেরকে থামিয়ে দিল এলাহি। 'মেজর শাকিল, এবার কিন্তু কোন অজুহাত শুনতে রাজি নই আমি। আপনি ব্যক্তিগতভাবে দেখুন ব্যাপারটা। দু'জনেই যেন মারা যায়।'

রানা ও কাসিমের দুই হাত চেপে ধরল কয়েকজন সৈনিক শক্ত হাতে। ল্যাব থেকে বেরুচ্ছে ওরা, সবার পিছনে হাতে পিস্তল নিয়ে মেজর শাকিল।

সিঁড়ি বেয়ে নামার পর সরু একটা প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা। এটা নতুন একটা প্যাসেজ, আগে ওরা ঢোকেনি। প্যাসেজের দু'পাশে খোলা কামরা দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। ঘরগুলোর মেঝেতে খড় দেখল রানা। অল্প কয়েকটা মশাল রয়েছে, সবগুলোই হোল্ডার থেকে জ্বলছে। ওর ধারণা হলো, এদিকে সম্ভবত সৈনিকরা থাকে—নেহাল তো তাই বলেছিল ওকে।

এবার ওর হাত বাঁধেনি ওরা। ডক্টর এলাহি এ নির্দেশও দেয়নি যে এখুনি ওকে গুলি করে মারো। ভাগ্যটা এখনও সাহায্য করছে। তবে পাক বিজ্ঞানীদের ঠেকাতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে ও। ডাইভার্টার মেশিন বানিয়ে ফেলেছে ওরা। সেটাকে রানা ধ্বংস করতে পারেনি।

কয়েক মিনিট পর একটা পাথরের দরজার সামনে থামল ওরা। দু'জন আদিবাসী বক কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিতে ধীরে ধীরে খুলল সেটা। ভেতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু গাঢ় অন্ধকার ওত পেতে আছে। বকেরা খুব সামান্যই খুলল দরজাটা, একটা মানুষ গলার জন্যে যতটুকু না হলেই নয়। আরেকজন গার্ড তার মশাল মাথার ওপর তুলে ধরল। পাথরের দেয়াল কেটে তৈরি করা ঘর বা খাঁচা দেখতে পেল রানা। এটা একটা কারাগার।

হঠাৎ পিঠে ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল রানা, তারপর তিন-চারজন চেপে ধরল ওকে, জোর করে ঢুকিয়ে দিল সামান্য খোলা দরজার ভেতর। প্যাসেজের মেঝে থেকে ঘরের মেঝে কয়েক ফুট নিচে, ধুলোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল রানা—বিষ্ঠা ও গা ঘিন ঘিন করা অন্য একটা অচেনা দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। লম্বাটে একটা আলো পড়ল মেঝেতে, সেখানে ছিটকে

পড়তে দেখা গেল কাসিমকে।

রানা দাঁড়াতে যাচ্ছে, তার আগেই আলোটা ফিরে গেল, ভারী দরজাটাও ভারী শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। 'কোথাও লাগল নাকি হে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, সার, ও কিছু না,' বলল কাসিম। 'এই জায়গাটা কি বলুন তো?'

কোন জানোয়ারের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে রানা। একটা অস্পষ্ট ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ ক্রমশ কাছে সরে আসছে। ওর শিরদাঁড়া জুড়ে ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল। এবার চারপেয়ে হিংস্র প্রাণীটার চোখ–জ্বলন্ত দু'টুকরো কয়লা–পরিষ্কার দেখতে পেল। পরমুহূর্তে ওটার নিচু, গমগমে গর্জন কাঁপিয়ে দিল পুরু পাথরের দেয়াল। রানা অনুভব করল, ওর পাশে থরথর করে কাঁপছে কাসিম, কিংবা ও হয়তো নিজেই।

ওদেরকে বাঘের ঘরে ফেলে গেছে ওরা।

দশ

কামরাটা প্রথমে গাঢ় অন্ধকার লাগলেও, সে-অন্ধকার একটু পরই চোখে সয়ে এলো, পাশে পড়ে থাকা কাসিমের কাঠামোটাকে চিনতে পারল রানা। মন্থর হলেও, বাতাসের একটা প্রবাহ অনুভব করছে, সম্ভবত সিলিঙের কোথাও থেকে ভেতরে ঢুকছে।

বড়সড় কামরাটার দূর প্রান্তে মনোযোগ দিল রানা। ওদেরকে ঘিরে থাকা অসংখ্য ছায়ার ভেতর থেকে গাঢ়তর কাঠামোটা চিনে

নিতে কোন অসুবিধে হলো না। ওদের কাছ থেকে পনেরো ফুট দূরে। নিচু হয়ে আছে, লাফ দেয়ার ভঙ্গি, চোখ দুটো দু'টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার।

কাসিমের দম আটকাবার শব্দ পেল রানা। তারপর শুনল, 'হায় খোদা! এই তোমার বিচার, শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটে পাঠালে?' মেঝেতে নিতম্ব ঘষে পিছিয়ে যাচ্ছে কাসিম। সিলিং আর দেয়াল থেকে খসে পড়া পাথরের টুকরোগুলোয় বাধা পেয়ে স্থির হলো সে।

বাঘ নড়ল। ফোঁ-ও-ও-ও-স্-স্, নিঃশ্বাসের দীর্ঘ শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। তারপর রানার কানে এলো চোয়াল চাটার শব্দ। এই বাঘকে না খাইয়ে রাখা হয়েছে। দু'জন মানুষকে পেয়ে খিদেটা চাগিয়ে উঠছে তার।

রানার সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। ওদেরকে খালি হাতে লড়তে হবে। মেঝে হাতড়ে ভারী একটা পাথর তুলল ও। নিজের ভাষায় বিড়বিড় করছে কাসিম, সম্ভবত আল্লাহকে ডাকছে।

বাঘ থামল। হয়তো ওদেরকে চুপচাপ ও স্থির দেখে অবাক হয়ে গেছে। কল্পনার চোখে দেখল রানা, এর আগে দুর্ভাগা যে-সব লোককে এখানে ফেলা হয়েছে তারা চিৎকার করেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছে। বাতাস শুঁকছে বাঘ। প্রকাণ্ড মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ছে। কপালের নিচে আগুনের টুকরো দুটো ওদের দিকে তাক করা।

'এবার লাফ দেবে!' ফিসফিস করল কাসিম।

রানা ভাবল, ও-ও কি আমার মত এত ঘামছে?

আবার এগোল বাঘ। এবার আরও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। লেজ নিয়ে সাত ফুট হবে।

হঠাৎ সিঁটকে বা কুঁচকে নিচু হলো বাঘটা, দীর্ঘ ঘাড়ের ভেতর অনেকটাই সেঁধিয়ে গেল মাথা, লম্বা লেজ উঁচু-নিচু হচ্ছে ঘন ঘন, চোখ দুটো রানার ওপর নিবদ্ধ। একদম চুপ হয়ে গেছে

জানোয়ারটা, এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দও অস্পষ্ট লাগছে কানে। এ-সব হলো তার হামলার প্রস্তুতি।

কর্কশ, বেঢপ পাথরটার ওজন অনুভব করল রানা। শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান দিয়ে ঘামের নদী বইছে। বাঘের ক্ষিপ্র গতি শুধু অনুভূতিতে ধরা পড়ল—ঝাপসা হলুদ একটা ধারা লাফিয়ে উঠল শূন্যে, ওর দিকে মিসাইলের মত ছুটে আসছে। দু'হাতে ধরা বড় একটা পাথর নিয়ে তৈরিই ছিল, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে বাঘের মাথায় মারল কাসিম। পরমুহূর্তে রানার ওপর চলে এলো বাঘ, ওকে ধরার জন্যে থাবা দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, শরীরের ওজন দিয়ে দু'পেয়ে শিকারকে পিষে ফেলতে চায়।

তবে মাথার আঘাত হামলাটাকে সফল হতে দিল না, সম্ভবত এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল বকেদের দেবতা। শরীরটা গড়িয়ে সরে যাচ্ছে রানা, সবটুকু শক্তি দিয়ে হাতের পাথর মারছে। বাঘের খুলি না ফাটার কোন কারণ নেই, অথচ গোটা মন্দির কাঁপিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জে উঠল ওটা। পিছিয়ে গেল। আবার লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শূন্য থেকে রানার গায়ে যেন একটা বুলডোজার এসে পড়ল—গড়িয়ে সরে যেতে পারলেও, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। বাঘের শরীরের সামনের কিছুটা এড়াতে পেরেছে ও, তবে বাকি শরীর দিয়েই ওকে প্রায় ঢেকে ফেলল ওটা, মনে হলো ওর পাঁজরের হাড় মট মট করে ভেঙে যাচ্ছে।

রানা আতঙ্কিত। দু'হাত দিয়ে ঠেলছে। জানে, এক মিনিটের মধ্যে ওজনের ভারেই মারা যাবে ও।

তবে বাঘ এভাবে শিকার করে না। চার পায়ে সিধে হলো, রানার মাংস চেরার জন্যে থাবা দিল, লালার স্রোত ভিজিয়ে দিচ্ছে রানার খালি গা। হাতের রক্তাক্ত পাথরটা প্রচণ্ড শক্তিতে ওটার চোয়ালে মারল ও। আবার হামলা করার জন্যে জায়গা দরকার, পিছিয়ে গেল ওটা। পাথর ছুঁড়ল কাসিম। একের প'র এক। তার

উদ্দেশ্য বাঘটাকে দিশেহারা করে তোলা, এবং ঠিক সময়ে যাতে তাল হারায়। তার ছোঁড়া পাথরগুলো দিশেহারা করতে না পারলেও, রানার ওপর মনোযোগ ধরে রাখতে দিল না। এই সুযোগে দাঁড়াতে পারল রানা।

লাফিয়ে উঠে থাবা চালাল বাঘ, শরীর মুচড়ে তার পথ থেকে সরে গেল রানা। অনুভব করল, ধারাল একটা নখ কাঁধে ঢুকল। নকশা আঁকা ত্বক বেয়ে রক্তের ধারা গড়াতে দেখতে পাচ্ছে। তবে আক্রমণের মূল ধাক্কাটা এড়াতে পেরে খুশি রানা, জানে থাবাটা ঠিক মত লাগলে খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যেত। হামাগুড়ি দিচ্ছে ও, চারপেয়ে শত্রুর নাগালের বাইরে থাকতে চায়। এই সময় অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে আবার গর্জে উঠল বাঘ, কারণ আবার ঠিক জায়গা মত—দুই চোখের মাঝখানে—ভারী একটা পাথর আঘাত করেছে। কাসিম আরও একটা পাথর ছুঁড়ল । তবে লাগল না এটা। এবার তার দিকে ছুটল বাঘ। কিন্তু কি মনে করে দিক বদলে আবার তাড়া করল রানাকে।

খেপে ওঠা বাঘের সঙ্গে আর কোনও বিপদের বোধহয় তুলনা হয় না। হামলা করার আগেই শিকারকে সে কাবু করে ফেলে পিলে চমকানো হুংকার ছেড়ে। এবার এত দ্রুত লাফ দিল ওটা, সরে যাবার সময় পাওয়া গেল না। তবে রানাও লাফ দিয়েছে। ঘটনা যদি সত্যিই কেউ সাজায়—প্রকৃতিই হোক বা ঈশ্বর—মাঝে মধ্যে তাঁর রসিকতাবোধের তারিফ না করে পারা যায় না। এই যেমন এখন, বাঘ ও রানার দুই লাফের পরিণতি হয়েছে—বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছে রানা, ওটার মোটা ঘাড় দু'হাতে বেড় দিয়ে ধরে বসে আছে, হাঁ করা চোয়াল ওর নাগাল পাচ্ছে না।

মোচড় খাচ্ছে বাঘ, পিঠ থেকে ফেলে দেবে রানাকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে লম্বা একটা পাথরকে হাতুড়ি বানিয়ে দমাদম কয়েকটা ঘা মারল কাসিম ওটার খুলিতে। থাবার বাড়িটা এড়াবার জন্যে স্যাৎ করে হড়কে গেল পিছন দিকে।

বাঘ আবার রানাকে ফেলার জন্যে শরীর মোচড়াচ্ছে। মাথা ঘুরিয়ে রানার বাহুটা চোয়ালে আটকাতে চাইল। রানা ওটার পিছনের দুই পায়ের ফাঁকে গোড়ালি দিয়ে উল্টো লাথি মেরে ওটার বিচি ফাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। নাছোড়বান্দা কাসিম মরিয়া হয়ে আবার এগিয়ে এলো, হাতে একটা গোল পাথর। তাকে দেখে খেঁকিয়ে উঠল বাঘ, থাবা তুলল ধরার জন্যে। পাথরটা ছুঁড়ল কাসিম। বাঘের দাঁতে লেগে ছিটকে তার দিকে ফিরে গেল ভারী পাথরটা। পিঠে রানাকে নিয়েই লাফ দিল উন্মত্ত বাঘ, তবে ততক্ষণে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে সরে যেতে শুরু করেছে কাসিম।

শূন্য থেকে মেঝেতে পড়ল বাঘের ভারী শরীর। ঝাঁকিটা রানার হাড়গুলোকে যেন গুঁড়ো করে দিল। ঘাড় ধরা হাত দুটোয় ঢিল পড়ল, শত্রু টের পাবার আগেই তার পিঠ থেকে নেমে এক পাশে সরে গেল রানা। সময় সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, দিকভ্রান্ত লাগছে, বাঘের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে কাসিমকে খোঁজারও সাহস নেই।

রানার দিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাঘটা। আবার মেঝের দিকে নিচু হলো লম্বা কাঠামো, বেরিয়ে থাকা এক একটা দাঁত যেন ছয় ইঞ্চি লম্বা, ওগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝড়ের মত শব্দ তুলে বেরিয়ে আসছে ফুসফুসের বাতাস। লেজটা অনবরত মোচড় খাচ্ছে।

রানা ডান দিকে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করে সরে এলো বাম দিকে। বোকা বাঘ ডান দিকেই তেড়ে গেল। তৈরি হয়েই ছিল কাসিম, পাশ থেকে আরেকটা পাথর দিয়ে আঘাত করল মাথার পাশে। তার প্রায় প্রতিটি আঘাত লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, বাঘটাকে প্রতি মুহূর্তে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। রানাও বাম দিকে সরে এসে হাতের পাথরটা ছুঁড়ে মারল। থ্যাচ্ করে যে আওয়াজটা হলো, সন্দেহ নেই বাঘের একটা চোখ গলে গেছে। ওটার গর্জনে ঘরের মেঝে পর্যন্ত কাঁপছে। চোখা ও লম্বা একটা পাথর আগেই বেছে

রেখেছিল রানা, ক্রল করে এগিয়ে দু'হাতের সর্ব শক্তি দিয়ে ছুঁচালো ডগাটা ঢুকিয়ে দিল ওটার অক্ষত চোখে। ওদিকে বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে ওটার মাথায় পাথর ঠুকছে কাসিম।

রানার চোখা পাথর চোখ হয়ে মগজে পৌঁছে গেল। পড়ে গেল বাঘ, পা চারটে শূন্যে ছুঁড়ছে।

'থাক,' কাসিমকে আর কষ্ট করতে নিষেধ করল রানা। এখুনি মারা যাবে ওটা। 'তোমার কি অবস্থা?'

'শালার দেবতা আমার হাতটা প্রায় ছিঁড়েই নিয়েছিল, সার!' সকৌতুকে অভিযোগ করল কাসিম। 'বকেরা খেপে যাবে, বুঝলেন। আর এলাহি মিয়া নির্ঘাত কেঁদে ফেলবে।' কোন কারণ নেই, হাসতে শুরু করল সে।

তার সঙ্গে রানাও। কিছু না, এ হলো চরম বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া।

বাঘটা স্থির হয়ে গেল।

প্রথমে কাসিমের ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল রানা। বেশ অনেকগুলোই গভীর, তবে বড় কোন শিরা ছেঁড়েনি। মাথা থেকে চামড়ার পট্টি খুলে ক্ষতগুলো বেঁধে দিল। ভাঁজ করা ছোট্ট ছুরিটা গুঁজে রাখল কোমরে জড়ানো কৌপীনে। এরপর সাধ্যমত রানার ক্ষতগুলোর যত্ন নিল কাসিম, সে-ও তার মাথার পট্টি থেকে পাওয়া ভাঁজ করা ছুরি কৌপীনে লুকিয়ে রাখল।

দু'জনেই ওরা অনেকক্ষণ দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকল, বিশ্রাম নিচ্ছে, শরীরকে সময় দিচ্ছে শক্তি ফিরে পাবার। এক সময় দাঁড়াল রানা, অনুভব করল প্রতিটি জয়েন্ট আড়ষ্ট হয়ে আছে। একটা দেয়ালের দিকে এগোল ও, যে দেয়ালে দরজাটা থাকার কথা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফাটলটা খুঁজছে। পাবার পর আঙুল দিয়ে অনুসরণ করল—দরজাটা চারফুট চওড়া, পাঁচ ফুট উঁচু। তবে দেয়ালের দুই পাশ হাতড়ে এমন কোন মেকানিজম পেল না যার সাহায্যে ওটাকে ঘোরানো যায় যত শক্তি দিয়েই চাপ দেয়া

হোক, এক চুল নড়ানো যাবে না, কয়েক মিনিট চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিল রানা।

কাসিম বলল, 'আজ বারো তারিখ। এখন সম্ভবত বিকেল।'

'চীন মিসাইল ছুঁড়বে কাল সকাল সাতটায়,' বলল রানা। 'আমাদের হাতে চোদ্দ থেকে ষোলো ঘণ্টা সময় আছে।'

'ওরা হয়তো আজ আর ফিরবেই না,' বলল কাসিম।

'ফেরার কিন্তু কথা,' বলল রানা। 'দু'দু'জন মানুষকে খেতে দেয়ার পর দেবতাকে ওরা তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে পানি দেবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে গোটা কামরায় তল্লাশি চালাল কাসিম। পাথরের একটা গামলা পেল সে। খালি ও শুকনো। 'আপনার ধারণাই ঠিক, সার। পানি নিয়ে আসবে ওরা।'

শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

কিন্তু সময় তো বসে নেই। হেড ব্যান্ড থেকে হাতঘড়ি বের করে কাঁটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। সন্ধ্যা সাতটা। রাত আটটা। মধ্যরাত। দুটো। তিনটে। চারটে।

ভোর।

ইতিমধ্যে কাসিমকে নিয়ে গোটা কামরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে রানা, ওই বন্ধ দরজা ছাড়া বেরুবার আর কোন ব্যবস্থা দেখতে পায়নি। এমন কি, দেয়াল বেয়ে সিলিঙ-এ পৌঁছানোও সম্ভব নয়। পৌঁছাতে পারলেও কোন লাভ হত কিনা কে জানে।

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। রানার মিশন ব্যর্থ হতে চলেছে। ডাইভার্টার মেশিনটায় ত্রুটি কিছু থাকবেই–সেটা বাদল চৌধুরীর ইচ্ছাকৃত হতে পারে, আবার অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। কিংবা, যদি ধরে নেয়া হয় কোন খুঁত নেই, তারপরেও সদ্য বানানো অত্যন্ত জটিল ও সফিসটিকেটেড একটা ইলেকট্রনিক্স মেশিন অপারেট করা সহজ কাজ নয়–পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা এক-আধটু ভুল করে ফেলতেই পারে।

ওই এক-আধটু ভুল চীনের একশো মেগাটন পারমাণবিক

বোমাটাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বসতে পারে–সেটা তখন কোথায় গিয়ে পড়বে কেউ বলতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি–শুধু ভারত, বাংলাদেশ বা মায়ানমার নয়–গোটা পৃথিবীই বিপদসীমার মধ্যে পড়ে যাবে।

দুনিয়ার এরকম একটা মহা বিপদে মাসুদ রানা অসহায়। পাথরের একটা ঘরে বন্দী ও। মাত্র একশো গজ দূরে রয়েছে ডাইভার্টার মেশিনটা। কিন্তু সেটার কাছে পৌঁছানোর সাধ্য নেই ওর।

কল্পনার চোখে আকাশের গায়ে ব্যাঙের ছাতাটাকে গজাতে বা আকৃতি পেতে দেখছে রানা। নাগাসাকি আর হিরোসিমার পর এই প্রথম কোন শহরের ওপর ফেলা হয়েছে অ্যাটম বোমা। দিল্লিতে না ঢাকায়, ইয়ানগনে না মুম্বাইয়ে, সিডনিতে না নিউ ইয়র্কে, কোথায় ফেলা হয়েছে সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হলো লাখ লাখ বা হয়তো কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে, এবং মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধ করার জন্যে দায়ী করা হবে বাংলাদেশকে।

কেন?

কারণ, ডাইভার্টার মেশিনটা বাংলাদেশ আবিষ্কার করেছে। ওই মেশিন ছাড়া বোমা সহ চীনের মিসাইল আকাশ থেকে হাইজ্যাক করা সম্ভব হত না। এরকম ভয়ঙ্কর একটা মেশিন আবিষ্কার যখন করেছে, বাংলাদেশের উচিত ছিল মেশিনটা বানাবার ফর্মুলা ও থিওরি গোপন রাখা এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

সভ্য সমাজ বাংলাদেশকে ঘৃণা করবে চিরকাল।

'চিৎকার করে কোন লাভ হবে?' জিজ্ঞেস করল কাসিম। 'যদি বলি তোমাদের বাঘ আমরা মেরে ফেলেছি? বকেরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেও কি দরজাটা খুলবে না?'

'তোমার চিৎকার এই কামরার বাইরে বেরুবে না,' বলল

রানা।

'আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

রানা জবাব দিল না। মুঠোর ভেতর ঘড়ি। পাঁচটা।

সাড়ে পাঁচটা।

ছ'টা।

'আর এক ঘণ্টা পর সাংহাই-এর লঞ্চিং প্যাড থেকে আকাশে উঠবে মিসাইলটা,' বিড়বিড় করছে কাসিম। 'সার, এত দুশ্চিন্তা আর অসহায়ত্ব আমার সহ্য হচ্ছে না–এরচেয়ে বরং বাঘের পেটে চলে গেলেই ভাল হোত!'

রানা নিরুত্তর। মুঠোর ভেতর ছ'টা পঁচিশ। ছ'টা ত্রিশ। ছ'টা পঁয়ত্রিশ। ছ'টা চল্লিশ।

উঁকি দিয়ে রোলেক্সের আলোকিত ডায়ালটা দেখছে কাসিম। 'আর বিশ মিনিট, সার। বিশ সেকেন্ডও বলতে পারেন। কারণ এখন যদি এই কামরা থেকে আমরা বেরুতেও পারি, কি কি কাজ বাকি থাকবে ভেবে দেখুন। বকেদের বাধা টপকাতে হবে, সৈনিকদের হামলা ঠেকাতে হবে, ল্যাবে ঢুকে পাকিস্তানী বিজ্ঞানীদের কাবু করতে হবে, তারপর ধ্বংস করতে হবে ডাইভার্টার মেশিনটা। ডক্টর বাদল চৌধুরী আর নেহালকে উদ্ধার, অস্ত্র সংগ্রহ, এ-সব নাহয় বাদই দিলাম। অর্থাৎ, আমরা হেরে গেলাম, সার।'

রানা ওখানে নেই, দেয়াল ধরে ঘুরছে ও, ঘুসি মেরে পরীক্ষা করছে অন্য কোন ফাটল আছে কিনা। ঘুরতে ঘুরতে একমাত্র ফাটলটার কাছে ফিরে এলো আবার। নেই, আর কোন ফাটল নেই।

হঠাৎ পাথর হয়ে গেল রানা। দম আটকাল। ওর কানের কাছে ফিসফিস করল কাসিম। 'শোনা যায় কি যায় না, মনে হলো কে যেন কথা বলল।'

অন্ধকারে ছুরির ভাঁজ খুলল রানা। 'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।'

'যদিও কোন লাভ নেই,' কাসিমের গলায় হতাশা। 'আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। আপনি বলেছেন, ঠিক সাতটায় মিসাইল লঞ্চ করবে চীন।'

রানার ঠোঁট থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে শব্দটা বেরুল, 'চুপ!'

অস্পষ্ট, তবে সন্দেহ নেই, আবার শোনা গেল মানুষের গলা।

কাসিমকে ঠেলে দরজার আরেক পাশে দাঁড় করাল রানা। কি করতে হবে জানিয়ে দিল কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে।

ফাটল ফাঁক হচ্ছে। শব্দটা কর্কশ অথচ ওদের কানে যেন মধুবর্ষণ করল—পাথরের সঙ্গে পাথরের ঘর্ষণ, হড়কানোর আওয়াজ। আঙুলের ডগায় অনুভব করল রানা, দরজা খুলে যাচ্ছে।

প্রথমে মাত্র এক ইঞ্চি ফাঁক হলো ফাটলটা। তারপর আরেক ইঞ্চি। মশালের লালচে আলো দেখা গেল—ফাঁক গলে আভা ঢুকছে শুধু।

মেজর শাকিলের গলা পরিষ্কার চিনতে পারল ওরা। কাকে যেন ধমকের সুরে তাগাদা দিচ্ছে।

রোলেক্স এখন মুঠোয় নেই, থাকলেও ডায়ালে চোখ বুলাবার সময় পেত না রানা; তবে মাথায় একটা হিসাব আছে—সাতটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি।

ফাটলটা আরও চওড়া হচ্ছে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। যেন এক যুগ লাগল মানুষ গলার মত ফাঁক হতে। কে কি করবে ঠিক করা ছিল, ওদের দু'জনের শরীরে একই সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বড় একটা পাথর দু'হাতে ধরে অপেক্ষা করছিল কাসিম, দরজার ফাঁকে সেটা বসিয়ে দিল—ফাঁকটা এখন আর বন্ধ করা যাবে না।

খোলা দরজার ঠিক সামনে কেউ নেই। তবে হাত লম্বা করতে কে বাধা দেয় রানাকে। সেই হাতেব ছুরি সামরিক উর্দি পরা মেজরের বুকের ঠিক নিচে ঢুকল, তারপর রক্তিম সরলরেখা তৈরি

করে নেমে এলো নাভি পর্যন্ত। নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আসছে, ছুরিটা টেনে বের করে নিল রানা, সেই সঙ্গে ফাঁক গলে পা রাখল করিডরে।

দু'হাত দিয়ে চেষ্টা করলেও, মেজর শাকিল চেরা পেটের ভেতর নিজের নাড়ীভুঁড়ি কোনমতেই আর ঢোকাতে পারছে না। তার সঙ্গে চারজন আদিবাসী বক এসেছে, একপাশে সরে গিয়ে তাদেরকে সামলানোর সুযোগ করে দিল রানা কাসিমকে। মেজর শাকিল রানাকে চিনতে পেরে পেট থেকে একটা রক্তাক্ত হাত প্রত্যাহার করে নিল, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করবে। একই উদ্দেশ্যে রানাও হাত বাড়িয়েছে।

এক সেকেন্ড পর ওর হাতেই গর্জে উঠল পিস্তলটা। দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিল শাকিল, কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। আরও দুটো গুলি করল রানা, দুই বক পুরোহিত ঝাঁকি খেলো। বাকি দু'জনের পেট চিরে দিয়েছে কাসিম।

দরজার পাশে এক গামলা পানি দেখল ওরা। নিহত এক বক পুরোহিতের পাশে পড়ে রয়েছে একটা ব্লো গান, খুদে বর্শা আর স্বচ্ছ তরল পদার্থ ভরা ছোট একটা টিউব–দেবতা শার্দূলের জন্যে ট্র্যাঙ্কুইলাইজার।

শাকিলের বেল্টে আটকানো পাউচে স্পেয়ার বুলেট পেল রানা। আশা করেনি, একজোড়া হ্যান্ড গ্রেনেডও পেল। কাসিম কোন আগ্নেয়াস্ত্র পেল না, শুধু বড় একটা ছোরা।

আরও দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে।

সময়টা সকাল, কিন্তু মন্দিরের ভেতর প্রতিটি প্যাসেজ ও টানেল অন্ধকার। কাসিমকে নিয়ে ছোটার সময় দেয়ালের একটা হোল্ডার থেকে মশালটা তুলে নিল রানা।

'কোথায় যাচ্ছি?' পিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করল কাসিম।

'ল্যাবে!' রানা না থেমেই জবাব দিল।

'সার!' থমকে দাঁড়াল কাসিম। 'কে যেন কাঁদছে না?'

ফিরে এলো রানা, কান পাততে শুনতে পেল বন্ধ একটা দরজার ভেতর থেকে ফোঁপানোর আওয়াজ বেরুচ্ছে। 'নেহাল!' পিছিয়ে এলো দু'জন একযোগে, তারপর ছুটে এসে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল দরজায়। চারবারের বার কব্জাসহ বিচ্ছিন্ন হলো কবাট। মশালটা তুলে নিয়ে কামরার ভেতর ঢুকল ওরা।

খড়ের গাদার ওপর বসে রয়েছে নেহাল, রানাকে দেখে লাফ দিয়ে ছুটে এলো।

'সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট,' বলল রানা, নেহালের হাত ধরে প্যাসেজে বেরিয়ে এসে আবার ছুটছে। 'পাকিস্তানী সৈনিকদের স্টোররুমটা কোন দিকে, বলতে পারবে, নেহাল? কিংবা ওদের সাপ্লাই কোথায় রাখা হয় জানো?'

মাথা নাড়ল নেহাল। 'জ্বী-না, মাসুদ ভাই, জানি না। তবে যে কামরায় শ্বেত পাথরের বেদি আছে, মানে যেখানে বকেরা মানুষকে জবাই করে, তার সরাসরি ওপরের একটা কামরায় এক সৈনিককে কিছু অস্ত্র রেখে আসতে দেখেছি।'

'প্রথমে ওখানেই যাব আমরা,' বলল রানা, ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

এক হাতে পিস্তল থাকলেও, এই মুহূর্তে রানার অপর হাতে লম্বা একটা ছুরি রয়েছে—মেজর শাকিলের বেল্ট থেকে পাওয়া। বাঘের ঘরের কাছে গুলি হলেও, পাথুরে দেয়ালের বাধা পেরিয়ে ল্যাব পর্যন্ত আওয়াজটা পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ। পৌঁছালে ডক্টর এলাহি নিশ্চয়ই এদিকে আরও সৈনিক পাঠাত। সে যাই হোক, ল্যাবের এত কাছাকাছি এসে একান্ত বাধ্য না হলে গুলি করতে চায় না রানা, প্রয়োজনে কাজ সারবে নিঃশব্দ ছুরি দিয়ে।

মানুষ জবাই করার ঘরে কেউ নেই। সিঁড়িতে সামনে পড়ল দু'জন সৈনিক। হেসে পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে, রানা ও কাসিমকে তারা বক ধরে নিয়েছে—ছুরি খেয়ে যখন হুঁশ ফিরল তখন আর কিছু করার নেই। লাশ টপকে সিঁড়ির মাথায় উঠে

এলো ওরা। বড় কামরাটায় ঢোকার আগে ভেতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল রানা। এই সময় পিছনে ধস্তাধস্তির শব্দ। ঘাড় ফেরাতেই দেখল একজন সৈনিকের গলায় ছুরি চালাচ্ছে কাসিম, পাশে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঢোক গিলছে নেহাল।

বড় ঘরটা পার হয়ে সরু একটা প্যাসেজে চলে এলো ওরা, এবার পথ দেখাচ্ছে নেহাল। দূর থেকেই দেখা গেল একটা দরজার সামনে রাইফেল হাতে পাক আর্মির একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে দেখল–কৌপীন পরা, উদাম গা, গায়ে রঙিন নকশা, মাথায় চামড়ার পট্টি–দু'জন আদিবাসী বক পিছনে এক বন্দী ছোকরাকে নিয়ে হেঁটে আসছে। সতর্ক হবার কোন প্রয়োজনই বোধ করল না সে।

রানা একেবারে শেষ মুহূর্তে পিস্তলটা দেখাল তাকে। ওরা শত্রু, চিনতে পেরে রাইফেলটা ফেলে দিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, হাঁটু দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঠক-ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে। কাসিম তাকে দিয়েই দরজাটা খোলাল। মশাল নিয়ে ঢুকতে গিয়েও রানা ঢুকল না–এটা সাপ্লাই রুমই, ভেতরে বারুদ আর বিস্ফোরক ঠাসা বললেই হয়।

উল্টো করা রাইফেল দিয়ে সৈনিকের মাথায় মারল কাসিম। বাঁটটাই যেখানে ভেঙে গেল, খুলির কথা আর না বলাই ভাল।

'আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি না তো?' বয়সের তুলনায় বেমানান, অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল নেহাল, মনে হতে পারে অকালপক্ব। 'চীন মিসাইলটা লঞ্চ করবে মায়ানমার সময় সকাল সাতটায়।' নিজের হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে কথা বলছে সে। 'এখন, স্থানীয় সময়, সাতটা বাজতে দু'মিনিট বাকি!'

র‍্যাকের ওপর নিজের ওয়ালথার পিস্তল ও প্রিয় ছুরিটা দেখতে পেয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা। তবে টাইম মেকানিজমসহ জেলিগনাইট স্টিক-এর চারটে স্তূপ দেখে নিজেকে বিস্মিত হবার সময় পর্যন্ত দিল না–পরীক্ষা করতে সময় নিল দশ সেকেন্ড,

ছেঁড়া তার জোড়া লাগিয়ে ঘড়ির কাঁটা সাতটা ত্রিশ মিনিটে সেট করতে আরও ত্রিশ সেকেন্ড।

সাপ্লাইরুম থেকে যার যা প্রয়োজন সব নিয়েছে ওরা, এমন কি, নেহালের হাতেও একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা এই বয়সেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান, পরিমিতি বোধেরও অভাব নেই—তার কথার উত্তরে কেউ কিছু না বলায় প্রসঙ্গটা আর তোলেইনি সে, ধরে নিয়েছে বড়দের মগজে সময়ের অন্য রকম আরও একটা হিসাব থাকতে পারে।

ল্যাবে ঢোকার আগে দু'জায়গায় বাধা পেল ওরা। প্রথমে দু'জন সৈনিক। একেবারে শেষ মুহূর্তে তারা বুঝতে পারল ওরা বক নয়। সরু প্যাসেজ, সিঁড়ি, ছোট্ট ঘর—এ-সব জায়গায় রাইফেল কোন কাজের অস্ত্র নয়, অথচ ডক্টর এলাহির রক্ষকরা সবাই রাইফেল নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। যাই হোক, এই দুই পাক সৈনিক শেষ মুহূর্তে যখন রাইফেল তুলতে যাবে, সেগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তাদেরকে স্নেহাস্পদ আপন ভাইয়ের মত আলিঙ্গন করল কাসিম ও রানা। সুদূর লাহোর বা করাচি থেকে আসা পাঞ্জাবী খুনী দু'জন ওদের আলিঙ্গনের ভেতর কোঁত পাড়ার মত শব্দ করছে। তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো ওরা, দু'জনের পেট থেকেই টান দিয়ে বের করে নিল যে-যার ছুরি।

প্যাসেজের মোড়ে দেখা হলো এক বক পুরোহিতের সঙ্গে। লোকটার অলৌকিক ক্ষমতা আছে কিনা কে জানে, ওদেরকে দেখামাত্র রণহুংকার বেরিয়ে এলো ওর গলা থেকে—বুঝে ফেলেছে ওরা দু'জন বক নয়। পারুক বা না পারুক, তিনজনের বিরুদ্ধে একাই ছুটে এলো বাগিয়ে ধরা বর্শা নিয়ে। কাসিমের থ্রো করা ছুরিটা দু'হাতে ধরল সে, বর্শা আগেই ফেলে দিয়েছে—রিফ্লেক্স অ্যাকশনই বলতে হবে—গলা থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করছে ফলাটা। তার কি পরিণতি হলো দেখার জন্যে ওরা কেউ থামল

না, এমন কি সময়ের অভাবে কাসিম তার ছুরিটার মায়াও ত্যাগ করল।

পনেরোটা ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে ওবা। এরপর আর মাত্র একটা প্যাসেজ। তারপরই সেই বিশাল কামরা–কারখানা তথা ল্যাবরেটরি। যেখানে বাদল চৌধুরীকে দিয়ে ডাইভার্টার মেশিনটা বানিয়ে ফেলেছে পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা।

ঘড়িতে এখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। মিসাইল লঞ্চ করার পর পাঁচ মিনিট পেরিয়ে যাবার মানে হলো ওটা সম্ভবত এরই মধ্যে কয়েকশো মাইল পাড়ি দিয়েছে। ডক্টর এলাহি যদি ডাইভার্টার মেশিনের সাহায্যে মিসাইলটার দিক বদলাতে সফল হয়ে থাকে, এই মুহূর্তে একশো মেগাটন ওজনের অ্যাটম বোমাটা ভারতের রাজধানী দিল্লিতে পড়তে যাচ্ছে। আর তার যদি ভুল হয়, মিসাইলটাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় পড়তে পারে ওটা–এমন কি তার নিজের মাথাতেও।

পনেরোটার মধ্যে এখনও সাতটা ধাপ উঠতে বাকি, কারবাইন থেকে ব্রাশ ফায়ারের বিকট শব্দ শুনে চমকে উঠল ওরা।

কে কাকে গুলি করছে? স্বার্থ উদ্ধারের পর ডক্টর বাদল চৌধুরীকে মেরে ফেলল ওরা? কিন্তু তাকে মারতে তো একটা বুলেটই যথেষ্ট, অটোমেটিক রাইফেল থেকে ব্রাশ করতে হবে কেন?

আবার সেই একই শব্দ। ব্রাশ ফায়ার, দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ধরে।

কারখানা তথা ল্যাবরেটরিতে আসলে ঘটছেটা কি?

এগারো

ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত বিজ্ঞানী ও সৈনিকরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডাইভার্টার মেশিনটার দিকে, কারও চোখে পলক পড়ছে না।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটার সময় চীনের সাংহাই মিসাইল ঘাঁটি থেকে লঞ্চ করা হয়েছে একেশো টনী নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ আইবিএম-টা। ডাইভার্টার মেশিনের কল্যাণে লঞ্চিং অপারেশন পুরোটা মনিটর স্ক্রীনগুলোর একটায় সবাই ওরা দেখতে পাচ্ছে। এক মিনিটের মাথায় বোমাসহ মিসাইলটা সাংহাই-এর দশ মাইল ওপরে উঠে এলো।

'বাদল চোদ্‌রি, ডাইভার্ট ইট!' হুকুম করল ডক্টর ইমরান এলাহি।

ঘর ভর্তি পাকিস্তানী সৈনিক, কম করেও পনেরোজন, হাতে রাইফেল নিয়ে তাকিয়ে আছে বাদল চৌধুরীর দিকে। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল ফারুক সৈয়দ। তার নির্দেশ পেতে যা দেরি, সৈনিকরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা বড় আকারের কন্ট্রোল প্যানেল সামনে নিয়ে বসে রয়েছে ডক্টর বাদল চৌধুরী। প্যানেলের সামনের অংশে রয়েছে বিশাল এক আলোকিত স্ক্রীন, তাতে ফুটে আছে পৃথিবীর বহুরঙা মানচিত্র। স্ক্রীনটার নিচে ও দু'পাশে শত শত সুইচ, ডায়াল, মিটার, লিভার ও হুইল দেখা যাচ্ছে—সেগুলোর

ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডক্টর বাদল চৌধুরী। বিশাল এই কামরা পুরোপুরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তা সত্ত্বেও দরদর করে ঘামছে সে। মূল স্ক্রীনের দু'পাশে আরও দুটো স্ক্রীন রয়েছে, মাঝেমধ্যে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ বা ডায়াল প্রয়োজন মত অ্যাডজাস্ট করছে।

মিসাইল লঞ্চ হবার দু'মিনিটের মাথায় মূল স্ক্রীনের একাংশে দেখা গেল ওটাকে, পরিষ্কার দিক বদল করছে। স্ক্রীনের বাকি অংশে এখনও ফুটে আছে মানচিত্র, তবে পৃথিবীর নয়–শুধু ভারতের। মিসাইলটা যে দিক বদলে ভারতের দিকে যাচ্ছে, অন্ধ ছাড়া সবাই তা বুঝতে পারবে।

পানের পিক গিলে ডক্টর এলাহি বাদল চৌধুরীর পিঠ চাপড়ে দিল, 'তুম দোস্ত সাচ্চা মুসলমান! তুমকো এতনা ইনাম মিলে গা, এতনা ইনাম মিলে গা...'

'ওই শালার বেটা, তোদের পুরস্কার রাখব কোথায়?' বাদল চৌধুরীর অবস্থা প্রায় কেঁদে ফেলার মত। 'ভারত যে কত বড় বাঁশ দেবে সেটা একবার ভেবে দেখেছিস?'

পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা গলা ছেড়ে হেসে উঠল, তারপর তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে ডক্টর এলাহি বলল, 'পাকিস্তানের কোনও দোষ নেই। ভারত বাঁশ দেবে বাংলাদেশকে, কারণ বঙ্গালী মইনুল হাসানের আবিষ্কার করা মেশিন দিয়ে তুমি এক বঙ্গালী দিল্লিকে গায়েব করে দিচ্ছ। বাংলাদেশকে বাঁশ দেয়া মানে মুসলমান নামের কলংক তেরো কোটি কাফেরকে বাঁশ দেয়া। তুমি তো সাচ্চা মুসলমান, তোমাকে আমরা রাজনৈতিক আশ্রয় দেব।'

'আগে ঠিক করো নিজেরা কিভাবে পালাবে, তারপর আমার কথা ভেবো...'

বাদল চৌধুরীর কথা শেষ হলো না, আবার হেসে উঠল বিজ্ঞানীরা । এবারও তাদের প্রধান বিজ্ঞানী সবার পক্ষ থেকে বলল, 'ইয়ানগনে আমাদের এয়ারক্রাফট এসে বসে আছে, সে

খবর রাখো? এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ রওনা হয়ে গেছে, চোদ্‌রি, যে-কোন মুহূর্তে মন্দিরের ডান পাশের ছাদে ল্যান্ড করবে। তোমাকে আমরা ফুলের মালা পরিয়ে একটা হেলিকপ্টারে তুলে দেব, ডাইভার্টার মেশিনটা সহ...'

পকেট থেকে ছোট্ট অথচ শক্তিশালী একটা টু-ওয়ে রেডিও বের করে কর্নেল ফারুক বলল, 'এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি আমি। এখুনি জানা যাবে কতক্ষণে পৌঁছাবে ওরা।' সাংকেতিক ভাষায় মেসেজ পাঠাতে শুরু করল সে।

ডক্টর সাখাওয়াত সর্দার টিভি মনিটরের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইল, 'মিসাইল কিন্তু সরল একটা পথ ধরে দিল্লির দিকে যাচ্ছে না। কেন?'

মিসাইল ও মানচিত্রের দিকে তাকাল সবাই। কথাটা সত্যি। মিসাইলটা সামান্য হলেও, দিক বদল করেছে।

'চোদ্‌রি!' হুংকার ছাড়ল ডক্টর এলাহি। 'কি ঘটছে? জানো নিশ্চয়ই, চালাকির পরিণতি কি হতে পারে?'

বাদল চৌধুরীর ঠোঁট আর চিবুক থর থর করে কাঁপছে, নার্ভাস অবস্থায় হাসতে চেষ্টা করলে যা হয় আর কি। 'তুমি সত্যি একজন মিসাইল এক্সপার্ট, নাকি এক নম্বর গর্দভ? ডাইভার্টার মেশিনটা ঠিক মত কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতেও দেবে না আমাকে? নিখুঁতভাবে কাজ না করলে কি ঘটতে পারে, জানো?' নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু বিরতি নিল বাদল চৌধুরী। 'দিল্লির বদলে বোমাটা লাহোরে পড়লে খুশি হও তোমরা?'

কর্নেল ফারুক রেডিও সেট অফ করে জিজ্ঞেস করল, 'সাংহাই থেকে রওনা হয়ে তিব্বতীয় মালভূমি এখনও পার হয়নি মিসাইলটা, সেক্ষেত্রে বোমা দিল্লিতে পড়বে কি লাহোরে পড়বে, এ প্রশ্ন ওঠে কি করে?'

কেউই তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমার কাছে একটা খারাপ খবর আছে। যে-কোন মুহূর্তে তুমুল

একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে, কাজেই মানসিকভাবে সবাই তৈরি থাকুন।'

'কর্নেল ফারুক,' প্রশ্ন করল ডক্টর এলাহি, 'আপনার বক্তব্য আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।' তার চোখ-মুখে বিরক্তির ছাপ।

'ইয়ানগন থেকে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার দশটা হেলিকপ্টার গানশিপ পাঠাচ্ছে,' বলল ফারুক সৈয়দ। 'এটা ভাল খবর। কিন্তু এই ভাল খবরটা আর ভাল থাকল না যখন আমাদের ব্যাংকক ইনফর্মার জানাল যে প্রায় একই সময়ে ভারতীয় এয়ারক্রাফট অর্জুন থেকে বিশটা হেলিকপ্টার গানশিপ এদিকে রওনা হয়েছে। হিসাবটা বুঝতে পারছেন, ডক্টর এলাহি?'

ডক্টর এলাহি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল, কথা বলতে পারছে না।

'ইয়ানগন এখান থেকে কম করে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে, বলল ফারুক সৈয়দ। 'আর গালফ অব থাইল্যান্ড খুব বেশি হলে দুশো কিলোমিটার। কারা আগে পৌঁছাবে বুঝে নিন।' শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল বের করল সে, তারপর কি মনে করে আবার যথাস্থানে রেখে দিল সেটা। 'ভারতীয় সৈন্যরা এখানে এসেই গুলি করে মারবে সবাইকে, সম্ভব হলে মিসাইলটার দিক বদলে দিল্লিকে রক্ষা করবে, তারপর বোমাটা করাচি বা ইসলামাবাদে ফেলবে। তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য ডাইভার্টার মেশিনটা নিয়ে যাওয়া।'

হুবহু ভিজে বিড়ালের মত দেখাচ্ছে ডক্টর এলাহি আর তার সহকর্মীদের। 'এখন তাহলে কি করব আমরা, সার, কর্নেল?'

কর্নেল অন্যমনস্ক। পাশে দাঁড়ানো সৈনিকের হাত থেকে ফুল লোড করা কারবাইনটা চেয়ে নিল সে। নেড়েচেড়ে দেখছে ওটা। 'আমরা কি করব? বাদল চৌধুরীকে দিয়ে মিসাইলটাকে সরাসরি দিল্লির দিকে তাক করাব, তারপর ডাইভার্টার মেশিনটা ভেঙে

টুকুরো টুকরো করে ফেলব। ভারত তার পুরো সেনাবাহিনী পাঠিয়েও কিছু করতে পারবে না। ডাইভার্টার মেশিন নেই তো মিসাইলের মুখ ঘুরিয়ে দিল্লিকে বাঁচাবার উপায়ও নেই। ডাইভার্টার মেশিন নেই তো ওটা নিয়ে যাবার প্রশ্নও নেই।'

'আর আমরা?' রুদ্ধশ্বাসে প্রায় একযোগে জানতে চাইল বিজ্ঞানীরা।

অকস্মাৎ সৈনিক ও বিজ্ঞানীদের দিকে হাতের কারবাইন তুলল কর্নেল ফারুক সৈয়দ। 'আমরা নই, আপনারা। আপনাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে।' কথা শেষ করেনি, তার আগেই ব্রাশ ফায়ার শুরু করল সে–একদিক থেকে আরেক দিকে, আরও একবার এদিক থেকে ওদিকে, সবশেষে বেছে বেছে কয়েকজনকে। তবে কন্ট্রোল প্যানেলে বসা বাদল চৌধুরীকে একটা বুলেটও স্পর্শ করল না।

নিজে এবং বাদল চৌধুরী ছাড়া কামরার সবাই মারা গেছে, নিশ্চিত হবার পর কয়েকটা লাশ টপকে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল ফারুক সৈয়দ, হাতের কারবাইন আগেই ফেলে দিয়েছে।

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর যেমন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, কাঁপুনির চোটে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খায়, বাদল চৌধুরীর ঠিক সেই অবস্থা। তবে আশ্চর্যই বলতে হবে, ফারুক সৈয়দ তার ঘাড়ে পিস্তলের মাজল চেপে ধরতে স্থির পাথর হয়ে গেল সে।

'আমি কেমন লোক, নতুন করে বোঝাতে হবে আপনাকে?' ঠাণ্ডা কঠিন সুরে জানতে চাইল ফারুক সৈয়দ।

বাদল চৌধুরী নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। তার ফোঁপানোর শব্দ অস্পষ্ট হলেও শোনা গেল, শুনে খুশিও হলো প্রতিপক্ষ।

'যা বলব একবার,' বলল ফারুক সৈয়দ। 'যদি শয়তানী করেন, আপনাকে মরতে হবে। কিংবা যদি মেশিনের কোন ভুল হয়, তাহলেও আপনাকে মরতে হবে। আমার কথা পরিষ্কার তো?'

মাথা ঝাঁকাল বাদল চৌধুরী। এবার আরও স্পষ্ট শোনা গেল তার ফোঁপানোর শব্দ।

এবার একটু সন্দেহ, একটু রাগ হলো ফারুক সৈয়দের। আপনি কাঁদছেন কেন? যারা আপনার ওপর জুলুম করছিল তারা নেই। তারা আপনাকে দিল্লির ওপর বোমা ফেলতে বাধ্য করছিল। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তারপরও আপনার এই মেয়েলি চাপা কান্না–এর অর্থ কি?'

'রক্ত আর বারুদের গন্ধ আমাকে আতংকিত করে,' ধরা গলায় বলল চৌধুরী। 'আমি কার পক্ষে কি করছি, এটা জানতে না পারলেও নার্ভাস বোধ করি।'

কর্নেল হাসল। 'আপাতত শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে আমরা বাংলাদেশের অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু।'

'তাই?' বাদল চৌধুরী একাধারে বিস্ময়, অবিশ্বাস ও বিমূঢ়তার শিকার।

'এবার কাজ শুরু করুন, চৌধুরী,' বলল ফারুক সৈয়দ। 'মিসাইলের টার্গেট বদলান। ওটা ভারতের কোথাও পড়বে না। পড়বে এখানে–,' এগিয়ে এসে স্ক্রীনে ফুটে থাকা ম্যাপের নির্দিষ্ট একটা বিন্দুতে আঙুল তাক করল সে। 'নতুন টার্গেট ফিক্স করার পর লক করে দিন, যাতে এমন কি আপনিও ওই টার্গেট বাতিল করতে না পারেন। কুইক, চৌধুরী!'

বাদল চৌধুরী ঘাড় ফেরাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, কারণ ঘাড়ের মাঝখানে পিস্তলটা হঠাৎ আগের চেয়ে জোরে চেপে বসল। 'কিন্তু আপনি? সত্যি করে বলুন তো, কে আপনি?' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সে। 'মেজর শাকিল, মেজর এহসান–এরা দু'জনেই আইএসআই সদস্য। আপনি তাদের লীডার। কিন্তু তাহলে...'

'এহসান তো আগেই মারা গেছে।' ফারুক সৈয়দ হাসল। 'আমার ধারণা মেজর শাকিলকেও পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে

আমার প্রিয় বন্ধু।'

'আপনার প্রিয় বন্ধু—কে?'

'কে আবার, মাসুদ রানা।' কর্নেলের মুখের হাসি আরও চওড়া হলো। 'সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকতে হবে আমাকে। আমরা যে পরস্পরকে চিনি, এই তথ্যটা চেপে গিয়ে আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন উনি। তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করুন, চৌধুরী! আমার ধারণা, আমার প্রিয় বন্ধু যে-কোন মুহূর্তে এখানে পৌঁছে যাবেন।'

ঘাড়ে পিস্তলের মাজল নিয়ে আবার মিসাইলের দিক বদল করল বাদল চৌধুরী।

'কোথাও কোন চালাকি করেননি তো, চৌধুরী? আমার দেখানো টার্গেটেই বোমাটা পড়ছে তো?' পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে দিয়ে একজন সৈনিকের পাশ থেকে নতুন আরেকটা কারবাইন তুলে নিল সে।

'জ্বী!' আবার ঠক-ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে বাদল চৌধুরীর দু'সারি দাঁত।

'মেশিনে কোন ক্রটি নেই তো?' প্রশ্ন করল ফারুক সৈয়দ। 'আগেই বলেছি, মেশিনের ক্রটি থাকলে আপনাকেই দায়ী করা হবে।' হাতের পিস্তল এখনও বাদল চৌধুরীর দিকে তাক করে রেখেছে সে।

'জ্বী-না, মেশিনে কোন ক্রটি নেই,' আশ্বস্ত করল বাদল চৌধুরী। 'পরীক্ষা করে দেখলাম তো—যা বলছি তাই শুনছে আমার ডাইভার্টার।'

'আপনার ডাইভার্টার, তাই না?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল ফারুক সৈয়দ। 'চেয়ার ছেড়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে থেকে উঠে আসুন, প্লীজ।' বিনা প্রতিবাদে চেয়ার ছাড়ল বাদল চৌধুরী। দরদর করে ঘামছে সে।

পিছিয়ে এলো ফারুক সৈয়দ। পাথরের দেয়ালের গায়ে হাত

রেখে একটা খাঁজের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে খুঁজে নিল একটা বোতাম। সেটায় চাপ দিতেই কর্কশ ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে ফাঁক হয়ে গেল কামরার এক দিকের দেয়াল। জানালা আকৃতির, চৌকো। 'বাইরে তাকান, চৌধুরী। আমাদের প্রস্তুতি দেখুন। ওরা ডাইভার্টার মেশিনটা নিয়ে যাবে। সেজন্যেই আসছে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বাদল চৌধুরী দেখল, একদিকের আকাশ প্রায় ঢেকে ফেলে উড়ে আসছে এক ঝাঁক ভয়ালদর্শন হেলিকপ্টার গানশিপ। 'ওগুলো কোন দেশী, কর্নেল সৈয়দ?'

'ওগুলো ভারতীয়,' জবাব এলো পিছন থেকে, মাসুদ রানার ভারী ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ঝট করে দরজার দিকে ঘুরল কর্নেল ফারুক সৈয়দ, তার সঙ্গে বাদল চৌধুরীও। কর্নেলের হাতে কারবাইন, রানার হাতেও তাই। রানার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাসিম ও নেহালও সশস্ত্র।

'হ্যাল্লো, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড!' আনন্দ ও উল্লাসে অধীর হয়ে রানার দিকে এগিয়ে এলো কর্নেল। 'আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। জানতাম ওই বাঘ বা মেজর শাকিল আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' ডান হাতটা বাড়াল সে। 'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব! আমাকে চিনতে পেরেও আপনি পরিচয় না দেয়াতে এখনও আমি বেঁচে আছি, আমার মিশনও সফল হতে চলেছে...'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা, শান্ত গলায় বলল, 'তোমাকে আমার চেনা-চেনা লেগেছে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারিনি–এখনও মনে করতে পারছি না কোথায় তোমাকে দেখেছি।'

ডান হাতটা আবার বাড়াল কর্নেল ফারুক। 'আমাদের দেখা হয়েছিল ব্রিটেনে, রয়্যাল মিলিটারি কলেজে। সে কি আজকের কথা, প্রায় দুই যুগ হতে চলল–ভুলে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

তবে আমি কিন্তু আপনাকে ভুলিনি। তার কারণ, আপনার সাফল্য ও কৃতিত্ব এসপিওনাজ জগতে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে...'

'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে,' বলল রানা, এবং সত্যি মনে পড়ছে। 'তুমি রাজীব মালহোত্রা, মাত্র এক মাস পরই কলেজ ছেড়ে চলে যাও।'

'কলেজ ছাড়তে বাধ্য হই। ভারত থেকে নতুন কাগজ-পত্র আসল, বলা হলো এখন থেকে আমি মোহাম্মদ ফারুক সৈয়দ, কাগজ-পত্র প্রমাণ করবে পাকিস্তানেই আমার জন্ম; আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো নতুন সামরিক কলেজে ভর্তি হও, তারপর পাকিস্তানে গিয়ে ওদের সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে আইএসএস-এর স্লীপার এজেন্ট হয়ে বসে থাকো। যদি কোনদিন প্রয়োজন হয়, ডাক পাবে। এত বছর পর আইএসএস চীফ কৈলাস জাঠোর ডাক দিলেন, আমিও পাকিস্তানীদের নিয়ে মায়ানমারে চলে এলাম।' হাসল রাজীব মালহোত্রা। 'আপনার কাজ কিন্তু আমিই করে ফেলেছি—এই কামরা থেকে এক শালা পাকিস্তানীকেও পালাতে দিইনি।'

'হুম।' রানা গম্ভীর।

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে বারবার তাকাচ্ছে রাজীব মালহোত্রা স্ক্রীনে দেখা গেল মিসাইলটা পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে আফগানিস্তানের দিকে চলে যাচ্ছে। 'চৌধুরী! মিসাইল ওদিকে কোথায় যাচ্ছে?' অকস্মাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল ভারতীয় স্লীপার এজেন্ট।

বাদল চৌধুরীর মুখে কাষ্ঠহাসি। 'চীনের আইবিএম সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই, তাই বোকার মত এরকম একটা প্রশ্ন করলেন। ওদের মিসাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, একটা মিসাইলকে প্রথমে যে টার্গেট দেয়া হয় সেটা বদলে অন্য টার্গেট দিলেও প্রথম টার্গেটে পৌঁছাতে যে পরিমাণ ফুয়েল পুড়ত, সেই

একই পরিমাণ ফুয়েল পুড়িয়ে পরিবর্তিত টার্গেটে আঘাত করবে—এক্ষেত্রে মিসাইলট্যাকে পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দিতে হবে, কারণ চীন মিসাইলটাকে যেখানে পাঠাচ্ছিল ঘোরাপথে সেখানে পৌঁছাতে ওই পাঁচ হাজার মাইলই পাড়ি দিতে হত।'

'ওহ্, গড!' অসহায় একটা ভঙ্গি করল মালহোত্রা। 'তারমানে বোমাটা ইসলামাবাদে পড়তে এখনও অনেক দেরি আছে?'

'কি বললে?' রানা চমকে উঠল। 'বোমাটা ইসলামাবাদে পড়বে?'

রাজীব মালহোত্রা হাসল। 'বলা হবে চীনের অদক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে মিসাইলটা বিপথগামী হয়ে পড়ে, তারপর আঘাত করে ইসলামাবাদে। টিট ফর ট্যাট, বলতে পারি না? ওরা আপনাদের ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল, আপনাদের আবিষ্কৃত ডাইভার্টার মেশিন প্রায় সত্তর লাখ মানুষকে কয়েক সেকেন্ডে খতম করতে সাহায্য করছে। একটু হয়তো দেরি হয়ে গেল, কিন্তু এরচেয়ে মিষ্টি প্রতিশোধ আর কিছু হতে পারে?'

রানা চৌকো জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে ভারতীয় হেলিকপ্টার গানশিপগুলো মন্দিরের বাম পাশের সমতল ছাদে ল্যান্ড করছে—ধীরে ধীরে, প্রতিবার একটা করে। মন্দিরের ডান পাশের ছাদটা এখান থেকে ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তবে রানার ধারণা সেখানে আগেই এসে বসে আছে পাকিস্তানী নৌ-বাহিনীর কয়েকটা হেলিকপ্টার গানশিপ। ওদিকের ছাদটা নিচু হওয়ায় ভারতীয় পাইলটরা তাদেরকে দেখতেও পাবে না।

'মিস্টার রানা, আমাদের ডাইভার্টার মেশিনটার কি হবে?' হঠাৎ জানতে চাইল বাদল চৌধুরী। 'ফারুক সাহেব—ইয়ে, না—মালহোত্রা মশাই বলছিলেন ওটা ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে।'

হাসল রানা, হঠাৎ বসের বলা একটা কথা মনে পড়ে গেছে। স্পষ্ট নির্দেশই ছিল সেটা—'ওরা যদি ডাইভার্টার মেশিনটা বানিয়ে ফেলে, যে-কোন মূল্যে সেটাকে ধ্বংস করে দিয়ে আসবে তুমি।'

স্ক্রীনের দিকে তাকাল ও। বৃত্ত রচনা করছে চীনা আইবিএম। ফিরে আসছে পাকিস্তানের দিকে। এখন যদি ডাইভার্টার মেশিনটা ধ্বংস করে দেয় ও, ইসলামাবাদের লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে। বেশিরভাগই তারা নিরীহ, সাধারণ মানুষ–রানা বা বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই।

কিন্তু ডাইভার্টার মেশিন ধ্বংস না করলে ভারতীয়রা নিজেদের দেশে নিয়ে যাবে ওটা। শুধু উপমহাদেশে নয়, গোটা বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। মানচিত্র থেকে স্বাধীন অনেক দেশের নামই চিরকালের জন্যে মুছে যেতে পারে।

রানা কি ভাবছে রাজীব মালহোত্রা তা জানে। তারও একটা হিসাব আছে। মাসুদ রানাকে পাইকারী মানুষ হত্যায় রাজি করানো সম্ভব নয়, আবার মেশিনটাও সে ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজি হবে না। রানার সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছে–তাকে, মালহোত্রাকে, খুন করে বাদল চৌধুরীকে দিয়ে আবার মিসাইলটার দিক বদলানো। কিন্তু প্রাণ থাকতে মালহোত্রা তা হতে দেবে না।

অ্যাকশন যখন শুরু হলো, প্রথমে বোঝাই গেল না কে কাকে টার্গেট করছে। রানা, কাসিম ও নেহালের হাতে গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল ও পিস্তল। রানার রাইফেলের বুলেট ডক্টর এলাহির দুই চোখের মাঝখানে ঢুকল। লোকটা মরেনি, সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নিহত একজন সৈনিকের কারবাইন তুলছিল বাদল চৌধুরীর দিকে। কাসিমের বুলেটও লাগল ডক্টর এলাহিকে। একা রাজীব মালহোত্রাই শুধু ব্রাশ ফায়ার করল–সরাসরি ডাইভার্টার মেশিনের কন্ট্রোল প্যানেল লক্ষ করে। ঝাঁক-ঝাঁক তপ্ত সীসা ভেঙে চুরমার করে দিল সেটাকে। গুলি নেহালও একটা করেছে, এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার পিস্তলের মাজল থেকে।

ওই একটা গুলিই লেগেছে মালহোত্রাকে। লাগবি তো লাগ একেবারে ফুসফুসে। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে। তারপরও

হাসছে সে। খক-খক করার ফাঁকে বলল, 'আমার জন্ম সার্থক হলো, মিস্টার রানা। সারা জীবনে এই একটাই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে। জাতির দুশমনকে বিরাট এক আঘাত হেনেছি, ইতিহাস চিরকাল মনে রাখবে।'

'ঘোড়ার ডিম আঘাত হেনেছিস, শালার বেটা শালা!' হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল বাদল চৌধুরী। 'তোমরা, ভারতীয় আর হারামী পাকিস্তানীরা, আমাদের বাঙালীদের মনে করো গরু, ঘাস খাই, না? ওরে শালারা, এ-কথা একবার ভেবে দেখলি না—মেশিনটা আমরা তৈরি করেছি, কাজেই এর কিছু কিছু রহস্য শুধু আমরাই জানব...'

'সংক্ষেপ করুন,' বলল রানা।

থতমত খেয়ে গেল বাদল চৌধুরী। তারপর নিঃশব্দে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল।

'কি হলো আপনার?' রানা বিরক্ত।

'আর বোধহয় দশ মিনিট বাকি আছে!' ভাব দেখে মনে হলো অদৃশ্য একটা আতংক ধীরে ধীরে গ্রাস করছে বাদল চৌধুরীকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। অকস্মাৎ লাশ টপকে ছুটল সে, উল্টে পড়া চেয়ারটা সিধে করে বিধ্বস্ত কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসল, ছেঁড়া তারগুলো ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে আসায় আগুনের লাল নীল ফুলকি ছুটছে, সে-সব গ্রাহ্য না করে জোড়া দিতে লাগল, এটা-সেটা মেরামত করছে, 'পালান, মাসুদ রানা! নেহালকে নিয়ে দৌড় দেন!' ফোঁপাচ্ছে সে।

'পালাব কেন?' রানা এখন আর বিরক্ত নয়, কি যেন একটা আন্দাজ করে সাংঘাতিক ভয় পাচ্ছে।

'আপনিই বলুন—আমার কি পারা উচিত ছিল?' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল বাদল চৌধুরী। 'উচিত ছিল জেনেশুনে দু'দল কুত্তার বাচ্চার হুমকিতে ওই বোমা দিল্লি কিংবা ইসলামাবাদে ফেলা? যখন দেখলাম আর কোন উপায় নেই, চীনা আইবিএম-কে

টার্গেট দিলাম,' মেঝেতে পা ঠুকল সে, 'এই জায়গা—বক আদিবাসীদের এই অভিশপ্ত মন্দির...'

অকস্মাৎ নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সবাই।

বারো

'ভগবান!' পাথরের মত ভারী নিস্তব্ধতা ভাঙল রাজীব মালহোত্রার কথায়। 'এ তুমি আমাকে কি শোনালে!'

নিজের গলার আওয়াজ রানা চিনতে পারছে না, যেন একটা হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে আসছে। 'বোমা নিয়ে মিসাইলটা এখানে আসছে?'

আবার কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাদল চৌধুরী। 'পালান, মিস্টার রানা! নেহালকে নিয়ে যতদূর পারেন সরে যান...'

'আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!' একটু একটু কাঁপছে রানা। 'এখানে একটা অ্যাটম বোমা ফাটবে—আর আপনি আমাদেরকে পালাতে বলছেন? এর মানে তো আপনি পাগল হয়ে গেছেন।'

'ও শালা মিথ্যে কথা বলছে, বোমাটা ইসলামাবাদেই পড়বে...,' কথাটা বলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল রাজীব মালহোত্রা।

'আর আট মিনিট বাকি, মিস্টার রানা! যা বলছি শুনুন! পালান!' হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে আবার কন্ট্রোল প্যানেল মেরামত

করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাদল চৌধুরী। 'জ্বী-না, আমি পাগল হইনি। পালাতে বলছি, কারণ, চেষ্টা করে দেখছি মিসাইলটাকে আরেক দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কি না, কিংবা ওঅরহেডটাকে যদি ডি-অ্যাকটিভেট করা সম্ভব হয়...'

'কিন্তু আপনার কি হবে?' দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান লোকটাকে ফেলে রানার যেতে ইচ্ছে করছে না।

'পালান! পালান! আমি সফল হলে আপনারা বাঁচবেন, নেহাল বাঁচবে, বাংলাদেশের বিপদ কেটে যাবে-এর বেশি কিছু চাই না আমি।' আবার হাতঘড়ি দেখল। 'মিসাইল আসছে। আর সাড়ে সাত মিনিট!'

রানার হাত ধরে টান দিল কাসিম, তার অপর হাতের মুঠোয় নেহালের কব্জি। 'মিসাইল যদি না-ও আসে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভারতীয় বা পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে মারা পড়ব। অন্তত ওদের কাছ থেকে পালাই চলুন।'

কামরা থেকে বেরুবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে বাদল চৌধুরী আর কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে শেষ একবার তাকাল রানা। প্যানেলটার বলতে গেলে কিছুই নেই, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ওটা যে মেরামত করা সম্ভব নয়, বাদল চৌধুরীও তা জানে। তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠতে দেখল রানা। কান্নাটা চেপে রেখেছে, তাই কোন শব্দ হচ্ছে না। এ কিসের কান্না, রানা উপলব্ধি করতে পারল। প্রায় এক কোটি হিন্দু বা মুসলমানকে বাঁচাতে পারার আনন্দে কাঁদছে বাদল চৌধুরী। মানবজাতির এত বড় উপকার করার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। বাদল চৌধুরী একজন বাঙালী, সেজন্যে গর্বে ওর বুকটা ফুলে উঠল।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় কাসিম ও নেহালকে নিচের দিকে ঠেলে দিল রানা। 'তোমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় অপেক্ষা করবে। আমি আসছি!'

'কোথায় যাচ্ছেন, সার?' কাসিম গাওয়া হতভম্ব।

'বাদল চৌধুরীকে একা ফেলে যাব? কক্ষনো না!' বলে ধাপ বেয়ে ছুটল রানা।

বাদল চৌধুরীকে রাজি করানো গেল না, কাজেই কখনও তাকে টেনে-হিঁচড়ে, আবার কখনও আক্ষরিক অর্থেই ঘাড়ে-পিঠে তুলে নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো রানা। ভারতীয় হেলিকপ্টার গানশিপ দেখে বক আদিবাসীরা জঙ্গলের আরও গভীরে পালিয়ে গেছে। আর দু'চারজন পাকিস্তানী সৈনিক যারা বেঁচে আছে তারা আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে মন্দিরেই কোথাও লুকিয়েছে। মন্দির থেকে বেরুবার সময় কাসিম ও নেহালকে বাধা দেয়ার মত কেউ ছিল না। রানার বেলায়ও কাউকে দেখা গেল না। ভারতীয় সৈন্যরা গানশিপ থেকে বেরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছাদ থেকে নিচে নামার কোন পথ দেখতে পায়নি। পাবার কথাও নয়, কারণ পাথরের দেয়ালে সূক্ষ্ম যে ফাটলটা আছে সেটা প্রসারিত করা না গেলে সিঁড়িটা দেখতে পাওয়া যাবে না। ওই ফাটল প্রসারিত করতে হলে লুকানো একটা বোতামে চাপ দিতে হবে। সেই বোতামের হদিশ আইএসআই-এর রিজিওনাল ডিরেক্টর কর্নেল ফারুক সৈয়দ জানলেও জানতে পারে, কাজেই তার নির্দেশের জন্যে ছাদেই অপেক্ষা করছিল ভারতীয় নৌ-কমান্ডোরা। তারা তো আর জানে না যে ফারুক সৈয়দ ওরফে রাজীব মালহোত্রা মারা গেছে।

তবে নির্দেশ আসতে দেরি হচ্ছে দেখে নৌ-সেনারা ছাদ থেকে রশির মই বেয়ে নিচে নামল, তারপর বাগিয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভেতর। এই ঘটনার ঠিক এক মিনিট আগে বাদল চৌধুরীকে ঘাড়ে নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে রানা।

ওর ঘাড়ে বসেই প্রলাপ বকছে বাদল চৌধুরী, 'কাকে বোঝাব? কে শুনবে? মেশিনটা প্রায় মেরামত করে ফেলেছিলাম,

আর মাত্র দু'মিনিট সময় পেলে নিশ্চিত হতে পারতাম ডি-অ্যাকটিভেট করা গেছে কিনা! কিন্তু এই বোকা ভদ্রলোকটি চাইলেন অ্যাটম বোমা খেয়ে মারা যাবেন। কে জানে, উনি হয়তো ভাবছেন, এভাবে মরার মধ্যে এক ধরনের মহিমা আছে...'

মন্দির থেকে দুশো গজ দূরে এসে হাঁপাতে লাগল রানা–শুধু যে ভার বহন করার ধকলে, তা নয়, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠাতেও।

মৃত্যু যখন অবধারিত হয়ে ওঠে, প্রায় সব মানুষই সেটাকে মেনে নেয়। এই মুহূর্তে রানাও মেনে নিয়েছে। জানে এখন আর দেশ, মানুষ, বন্ধু, দুনিয়া–কোন কিছুরই কোন তাৎপর্য নেই; সব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও ঢেঁকির সেই নাছোড় অভ্যাসের মত কয়েকটা চিন্তা পলকের মধ্যে খেলে গেল মাথায়। দেশটাকে ভয়ানক এক বিপদের মধ্যে ফেলে যাচ্ছে। বস্ নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন, বলবেন, অন্তত এই মিশনে রানার ব্যর্থ হওয়া একদমই উচিত হয়নি...

চিন্তায় বাধা পড়ল গাছাপালার আড়াল থেকে কাসিম আর নেহালকে ছুটে আসতে দেখে। ফাঁকা জায়গাটার দিকে যায়নি ওরা, কারণ ওখান থেকে মন্দিরটা দেখতে পাওয়া যায় না। বাদল চৌধুরী রানার ঘাড় থেকে আগেই নেমেছে, তবে প্রলাপ বকছে এখনও, 'অ্যাটম বোমা পড়ছে জেনেও কেউ যদি পালাতে বলে, সে অবশ্যই একটা পাগল–হ্যাঁ,' নিজের বুকে একটা আঙুল রাখল, 'এই লোকটাকে আপনারা অবশ্যই পাগল বলতে পারেন। তবে এই পাগলের এই কথাটা মিথ্যে নয়–আর তিন মিনিট পর মিসাইলটা মন্দিরের মাথায় পড়বে।'

তিন মিনিট পার হলো না, রোমহর্ষক ঘটনা একের পর এক ঘটতে শুরু করল। রানার অনুমানকে মিথ্যে প্রমাণিত করে এতক্ষণে এসে পৌঁছাল পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর হেলিকপ্টার গানশিপগুলো। সব মিলিয়ে দশটা, একে একে মন্দিরের ডান পাশের সমতল ছাদে ল্যান্ড করল। পাকিস্তানী নৌ-সেনারা

ভারতীয় নৌ-সেনাদের মত দেরি করল না, রশির মই বেয়ে তরতর করে নিচে নামল তারা, দরজা খোলা পেয়ে লাইনবন্দী হয়ে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভেতর।

ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। মন্দিরের ভেতর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এখন তুমুল একটা যুদ্ধ শুরু হবে। কি ইস্যু নিয়ে যুদ্ধ, সেটা অবশ্য কোন পক্ষই জানে না। আর এ তথ্য তো জানেই না যে সবারই মাথার ওপর নেমে আসছে চীনের একশো মেগাটন অ্যাটম বোমা।

বাদল চৌধুরীর হিসাবে ভুল হয়েছে। তিন মিনিট নয়, মাত্র এক মিনিট বিশ সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হলো মন্দির। মিসাইলটা কোন পথ ধরে এলো তা ওরা কেউ দেখতে পায়নি। ঘন ও আকাশ ছোঁয়া গাছপালার আড়াল থাকায় দেখতে পাবার কথাও নয়।

নেহাল ঠক-ঠক করে কাঁপছে দেখে কাসিম তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। ঘড়ির ওপর চোখ রেখে বাদল চৌধুরী বিড়বিড় করছে, 'এমন তো হতেই পারে না! এক মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড আগে এলো কিভাবে!'

বিস্ফোরণে ওদের পায়ের নিচের মাটি এত জোরে কেঁপে উঠল, ঝোপের ডাল ধরতে না পারলে পড়ে যেত সবাই। দুই পক্ষের হেলিকপ্টারগুলোয় পাইলটরা ছিল, আকাশে উঠে পালাবার চেষ্টা করল তারা। এই সময় শুরু হলো বিরতিহীন বিস্ফোরণ। মন্দির সহস্র টুকরো হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ছে, সদ্য তৈরি ফাঁক, ফাটল ও গর্ত থেকে আগুনের চওড়া শিখা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে ঢেকে ফেলল কপ্টারগুলোকে। এতক্ষণে রানা বুঝতে পারল কি ঘটছে।

তিক্ত হাসি রানার ঠোঁটে। বিপদ কাটেনি। মন্দিরে মিসাইল আঘাত করেনি। প্রথমে বিস্ফোরিত হয়েছে পাকিস্তানীদের সাপ্লাইরুমে রেখে আসা জেলিগনাইটের চারটে স্তূপ। ওই কামরায় প্রচুর ডিনামাইট আর গোলা-বারুদও ছিল, সেগুলোও

সব বিস্ফোরিত হয়েছে।

'আমার হিসেবে কোন ভুল নেই!' অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল বাদল চৌধুরী, তাকিয়ে আছে উত্তর প্রান্তের আকাশে। 'ওই দেখুন, চীনের আইবিএম আসছে!'

ঝট করে তাকাল ওরা। উজ্জ্বল আলোর একটা সরু রেখা। চোখের পলক ফেলতে যা দেরি, কত দূর থেকে কত সামনে চলে আসছে।

'বিদায়! বিদায়!' পাগলের মত হাসছে বাদল চৌধুরী। 'বিদায় গো মা জননী জন্মভূমি! বিদায়, পৃথিবী! বিদায়!'

নেহাল এখন আর কাঁপছে না। বিহ্বল দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে মিসাইলটার দিকে। আসলে ওটার গতি এত বেশি, দৃষ্টি দিয়ে ঠিকমত অনুসরণ করা যাচ্ছে না।

কাসিম বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছে। তার চোখ দুটো বন্ধ।

রানাকে মনে হলো সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। ওর দৃষ্টি মিসাইলের সম্ভাব্য পথটার ওপর স্থির হয়ে আছে–জ্বলন্ত মন্দিরের কয়েকশো ফুট ওপরে। মিসাইল বলে চেনা গেল না, ঝাপসা মত কি যেন সেঁধিয়ে গেল অগ্নিকুণ্ডের ভেতর।

ওদের পায়ের তলায় আবার ঝাঁকি খেলো মাটি।

রানা জানে, মিসাইল মাটি স্পর্শ করা মাত্র ওঅরহেডটা বিস্ফোরিত হবে না। মাটি হোক বা পাথর, বোমাটাকে নিয়ে সোজা দুশো গজ গভীরে ঢুকবে ওটা। তারপর বিস্ফোরিত হবে বোমা।

দুশো গজ মাটি ভেদ করতে একটা মিসাইলের কতক্ষণ লাগতে পারে? প্রতি সেকেন্ডকে মনে হলো এক একটা যুগ। পাঁচ সেকেন্ড পর এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল নেহাল। না কাঁদার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ছেলেটা। যখন দেখল হেরে যাচ্ছে, রানার বুকে মুখ লুকাল। তার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করল রানা, 'গুড বয়! পুরুষমানুষকে কাঁদতে নেই।'

নেহালের বুকটা খালি হয়ে গেল। মাসুদ ভাই কোন অভয় বা

আশ্বাস দিলেন না।

দেড়শো গজ দূর থেকে মন্দির ভেঙে পড়ার আওয়াজ আর ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। আর কোন শব্দ বা কম্পন; কিংবা মাটি ভেদ করে ব্যাঙের ছাতা আকাশে ওঠার কোন লক্ষণ, কিছুই নেই।

তবে মিসাইল মাটি স্পর্শ করার পর মাত্র দশ সেকেন্ড পার হয়েছে। অপেক্ষার পালা এখনও শেষ হয়নি। এক মিনিট পর সবাই উপলব্ধি করল, যতই অপেক্ষা করা হোক, বোমাটা ফাটবে না। ভাঙা ডাইভার্টার মেশিনের সাহায্যেই অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করেছে বাদল চৌধুরী। রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে নিউক্লিয়ার ওঅরহেডটাকে ডি-অ্যাকটিভেট করতে সক্ষম হয়েছে সে।

বাদল চৌধুরীকে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করল কাসিম গাওয়া। ওদের সঙ্গে নেহালও যোগ দিল।

রানা উঠে বসল মাঝারি একটা বোল্ডারের ওপর, পা ঝুলিয়ে; তাকিয়ে আছে শূন্যে, যেন কি এক গভীর ধ্যানে মগ্ন।

***

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভলিউম ও রিপ্রিন্ট বাদে সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর আগের প্রায় সকল বই পাঠক-পাঠিকার জন্য বিশেষ বর্ধিত কমিশনে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য। অফিস চলাকালীন সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে

উড়ন্ত সসার, যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান, আমি গুপ্তচর

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মৃত্যুবীজ

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাঙালী বিজ্ঞানী ফারুক চৌধুরী এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন, দুনিয়ার মানুষের জন্যে যা আশীর্বাদ ও অভিশাপ। প্যারিসে শুরু হলো বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী স্পাই নেটওঅর্কের মধ্যে তীব্র মরণপণ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানীর মেয়ে তৃষা চৌধুরীকে কে কার আগে খুঁজে বের করতে পারে। তৃষাকে পেয়েও হারাল মাসুদ রানা, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা লাজুলির প্রশ্নের জবাব দেয়া হলো না, এমনকি বসের নির্দেশে পাষণ্ড ওয়াসিম মালিককে শাস্তি দেয়ার কথাও ভুলে থাকতে হলো, কারণ এখন ওর বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করে আনার জন্যে এমন এক জায়গায় যেতে হবে যেখান থেকে আজ পর্যন্ত ফিরে আসতে পারেনি কেউ।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। –কা. আ. হোসেন।

চৌধুরী ডন মাহমুদ

বানদীঘি, মধ্যপাড়া, এরুলিয়া, বগুড়া-৫৮০০

মাসুদ রানার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে প্রবেশ নিষেধে তারপর থেকে নিয়মিত পড়ে আসছি এবং প্রতিটি বই আমার ভাল লাগছে। রানার বই পড়ার আগে আমি কারও সঙ্গে মিশতাম না, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হলে আড়ষ্ট হয়ে পড়তাম, এড়িয়ে চলতাম। সব সময় ঘরে আর স্কুলে আমার দিন কাটত। এজন্য মা আমাকে প্রায়ই বকা দিত। কিন্তু মাসুদ রানার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর থেকে আমার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন আমি সবার সাথেই সহজ ভাবে মিশতে পারি, কথা বলি। এখন আমার সবকিছুই ভাল লাগে। আমার এই পরিবর্তনের পিছনে মাসুদ রানার ভূমিকা অপরিসীম। আপনাকে এজন্য সহস্র-সহস্রবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

* মাসুদ রানা পড়লে যে এই উপকার হয়, তা তো জানা ছিল না। ভাবছি, লেখা বাদ দিয়ে আমিও পড়তে লেগে যাব কিনা!

মীর আশরাফ

তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

আমার ধারণা এমন মানুষও আছে, যারা জীবনভর মাসুদ রানা পড়েছে, মারা গেছে বা মারা যাবে কিন্তু আপনাকে দু'কলম লেখেনি। আমার বেলায়ও তাই হতো, কিন্তু ব্যাখ্যাতীত কারণে কাগজকলম নিয়ে বসলাম।

আমি যখন ছোট, প্রাইমারীতে পড়ি তখন ছোটমামার বইয়ের ভাণ্ডার

থেকে কুয়াশা পড়তাম। একদিন 'ধ্বংসপাহাড়' পেয়ে গেলাম। ব্যস শুরু হলো যাত্রা। স্কুলে পড়ার সময় বাবাকে মাসুদ রানা পড়তে দেখতাম। বাবা টের পেতেন না তাঁরই বই পাশাপাশি আমিও পড়ছি। বাবা মারা গেছেন। আমার বয়স এখন বত্রিশ। এখনও মাসুদ রানা পড়ছি। মাসুদ রানা পড়ার সূত্র ধরেই সেগুনবাগিচার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। সরকারের তথ্য বিভাগ, সচিবালয়ে চাকরির সুবাদে সেগুনবাগিচায় ভাড়া বাসায় থাকি। আপনার বাড়ীর খুব কাছাকাছি। কিন্তু আপনার দেখা পাইনি এখন পর্যন্ত।

আমার জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে। মোকাবেলা করেছি মাসুদ রানার কাছ থেকে পাওয়া সাহস আর ভেঙে না পড়ার অদম্য মানসিক প্রত্যয় থেকে। মাঝে মাঝে ভাবি জীবনে তো প্রকৃত বন্ধু বলে কাউকে পেলাম না—মাসুদ রানাই হোক আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমি অনেক ছেলেমেয়েকে মাসুদ রানা সরবরাহ করেছি এবং তাদেরকে রানার একনিষ্ঠ পাঠক বানিয়েছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাগ্নী মাসুদ রানা পড়ে। ওকে এবার একুশে মেলা থেকে পপি, বুমেরাং, এখনও ষড়যন্ত্র, প্রমাণ কই, বিদায় রানা কিনে দিয়েছি।

রানার মত আমিও এখনও বিয়ে করিনি। আমার বাড়ী কুষ্টিয়া জেলায়। আপনার সাথে যদি দেখা হতো তাহলে একটা প্রস্তাব দিতাম—রানাকে বিয়ে দিন, আমিও বিয়ে করি। দেখতে আমি রানার মত অতটা না হলেও সুদর্শন। আপনার পক্ষ থেকে যদি কোন পাত্রীর সন্ধান পাই অবশ্যই বিয়ে করব আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাস্টার্স। আমি যেখানে কাজ করি, মাত্র চার ঘণ্টা কাজ করতে হয়, সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা। বাকি সময় আমি বেকার। বিনা পারিশ্রমিকে আমি যদি আপনার কোনও কাজে লাগতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করব।

একটি পরামর্শ দিচ্ছি। এখন যেসব মাসুদ রানা লেখা হচ্ছে, কাহিনীর ভেতর 'মাসুদ রানা' এই পুরো নামটা ব্যবহার হচ্ছে বারবার। শুধু রানা, ও, ওকে এসব ব্যবহার হওয়া উচিত বেশি, যাতে পাঠকের সঙ্গে ওর নৈকট্য অটুট থাকে। এবং আপনার হাত দিয়ে যা বেরিয়ে এসেছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়।

চিঠি বড় হয়ে গেল। কবে আপনাকে দাওয়াত খাওয়াতে পারব জানাবেন। আপনি আদৌ দাওয়াত খেতে অভ্যস্ত কিনা তাও জানাবেন।

* ঠিকই ধরেছেন, আমি তেমন একটা মিশুক মানুষ নই। আপনার চিঠিটি কেন জানি না আমার মনটাকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে দোলাল। মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে আমার ভাল লাগবে। চলে আসুন না একদিন ফোন করে।

মাসুদ রানা

বিপদসীমা

কাজী আনোয়ার হোসেন

আমেরিকা যতই হুমকি-ধামকি দিক, চীন কি ও-সবে কান দেয়! মিসাইলটা তারা ছুঁড়বেই, একশো মেগাটন ওজনের পারমাণবিক বোমাটাও তাতে থাকবে।
দখল করার পর বক-ধার্মিকরা যেখানেই ওটাকে ফাটাক বা ফেলুক,দায়ী করা হবে বাংলাদেশকে। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও, এটাই কঠিন বাস্তবতা।
এই পরিস্থিতিতে রানাকে বলা হয়েছে-যাও,ওদের ঠেকাও।
নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেলে বিসিআই এজেন্টরা কে না খুশি হয়,কিন্তু রানা যদি জানত ওই বোমা কে কোথায় ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে,তাহলে কি এই মিশনে যেতে রাজি হত ও??

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০